সাংস্কৃতিক ভূগোল

কে.বি.সাজ্জাদুর রশীদ

সাংস্কৃতিক ভূগোল

ডক্টর কে. বি. সাজ্জাদুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৮৮
[মার্চ, ১৯৮২]

বাঅ : ১২০১

মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

মুদ্রাকর
আবু আহম্মদ ভূইয়া
প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস
৪৪, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
আবুল বরক আলভী

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র

SANSKRITIK BHUGAL (Cultural Geography) by Dr. K. B. Sajjadur Rashid, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh.

www.pathagar.com

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক ভূগোল আধুনিক ভূগোলশাস্ত্রের পাঠ্যক্রমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূপৃষ্ঠে যুগ যুগ ধরে মানুষ তার কর্মকাণ্ডের নিদর্শন চিত্রিত করেছে; সুতরাং ভূগোলের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পারিসরিক বিশ্লেষণে সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আমাদের ব্যবহারোপযোগী সাংস্কৃতিক ভূগোলের একটি পাঠ্যবই-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিগত বছরগুলিতে সাংস্কৃতিক ভূগোল কোর্সে শিক্ষাদানের সময় পাঠ্যবই সংক্রান্ত যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, সেই পটভূমিতে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন বিবেচনা করে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয় তিন পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক ভূগোল পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতির ভূমিকা পরীক্ষা; দ্বিতীয় পর্যায়ে মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম সময়কাল থেকে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির বিবর্তনমূলক চিত্র বর্ণনা; এবং তৃতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভৌগোলিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ এ গ্রন্থের কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক ভূগোলের মৌলিক প্রকৃতি ও পরিসীমার এক সাবিক আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপান্তর প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে সাংস্কৃতিক ভূগোলে তার ভূমিকা ও গুরুত্ব দর্শানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত চিন্তাধারা তথা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কের মূল্যায়ন চতুর্থ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণে মানবজাতির ক্রমবিবর্তন এবং প্রস্তর যুগ থেকে শিল্পবিপ্লব পর্যন্ত প্রাযুক্তিক উন্নয়ন ধারা আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম হতে দ্বাদশ অধ্যায়ে সমকালীন পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক ভৌগোলিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্ণ, ভাষা ও ধর্ম এবং জনপদের বিচিত্র রূপ এ অংশে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভূগোলশাস্ত্রের অন্য সকল শাখার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল নির্ণয়ের এক পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ভূগোলের

www.pathagar.com

পাঠ্যসূচীতে এ প্রকার সাংস্কৃতিক জগৎ নিরূপণই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস। সাংস্কৃতিক ভূগোলের এই গ্রন্থে ভূপৃষ্ঠকে আদিকাল থেকে মানুষ যে উপায়ে রূপান্তরিত করেছে তার সার্বিক রূপ চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনায় বহু লোকের সহায়তা ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। সাংস্কৃতিক ভূগোল কোর্স শিক্ষাদানে ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আমার সহকর্মীদের গঠনমূলক সমালোচনা ও উপদেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নাবলী আমাকে এই গ্রন্থের রূপরেখা রচনায় সহায়তা করেছে। এ গ্রন্থ সাংস্কৃতিক ভূগোলের পাঠ্যবই-এর অভাব পূরণ করতে যদি সক্ষম হয়, তবে তার কৃতিত্ব ও গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য; আর এতে যেসকল ত্রুটি ও অভাব রয়ে গেল, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। পরিশেষে, আমি যাঁর কাছে সকল দিক দিয়ে ঋণী ও কৃতজ্ঞ, তিনি আমার স্ত্রী- যাঁর ধৈর্য, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত এ গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হ'ত না।

কে. বি. সাজ্জাদুর রশীদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসীমা ... ১

দ্বিতীয় অধ্যায় :

সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ... ১৫

তৃতীয় অধ্যায় :

সংস্কৃতির রূপান্তর ... ২২

চতুর্থ অধ্যায় :

মানব-পরিবেশ ও মিথস্ক্রিয়া ... ৩২

পঞ্চম অধ্যায় :

মানবজাতির ক্রমবিকাশ ... ৪০

ষষ্ঠ অধ্যায় :

প্রাযুক্তিক উন্নয়ন—১ ... ৫৮

সপ্তম অধ্যায় :

প্রাযুক্তিক উন্নয়ন—২ ... ৭১

অষ্টম অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য : বর্ণ (রেস্) ... ৮৭

নবম অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য : ভাষা ... ৯৭

দশম অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য : ধর্ম ... ১০৫

একাদশ অধ্যায় :

জনপদ : গ্রামীণ ... ১১৪

দ্বাদশ অধ্যায় :

জনপদ : নগরীয় ... ১২২

ত্রয়োদশ অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক জগৎ ... ১২৯

গ্রন্থবিবরণী ... ১৩৯

www.pathagar.com

পরিভাষা—১

বাংলা—ইংরেজী

অঙ্গসঞ্চালক ক্রিয়া—motor actions

অরীয়—radial

আত্তীকরণ—assimilation

আনুক্রমিক—hierarchical

উদ্‌বর্তন—survival

উপভাষা—dialect

ঋজু মানব—homo erectus

কর্তক দাঁত—incisor

কীলকাকার—cuniform

গুঁড়িগৃহ—log house

গার্হস্থ্যকরণ, গৃহপালিতকরণ } domestication

চরম উদ্ভিজ্জ—climax vegetation

চিত্রলিপি—hieroglyph

ছেদক দাঁত—canine (tooth)

জনপদ—settlement

জাতিকেন্দ্রিক—ethnocentric

জাতিতত্ত্ববিদ—ethnologist

দিব্যতান্ত্রিক—theocratic

নির্ণায়ক—criterion

পরিবর্তনকালীন—transitional

পরিবেশবাদ—environmentalism

পারিসরিক—spatial

পুঞ্জীভূত—clustered

পুনঃস্থাপিত প্রসারণ—relocation diffusion

প্রচরণ—migration

প্রত্নতত্ত্ববিদ—paleontologist

প্রত্নভাষাবিদ—paleo-linguist

প্রলক্ষণ—trait

প্রসারণ—diffusion

বর্ণ—race

বাস্তব্য, বাস্তব্যবিদ্যা—ecology

ব্যবহারিকতা—functionalism

ব্যাপন—diffusion

ভূতাপেক্ষ—retrospective

ভূদৃশ্য—landscape

মিথস্ক্রিয়া—interaction

লুণ্ঠনজীবী—predatory

সমসত্ত্বতা—homogeneity

সম্প্রসারণশীল প্রসারণ—expansion diffusion

সম্ভাবনাবাদ—possibilism

সর্বপ্রাণবাদ—animism

(সহজাত) সাংস্কৃতিকরণ—acculturation

www.pathagar.com

পরিভাষা—২

ইংরেজী—বাংলা

acculturation—(সহজাত) সাংস্কৃতিকরণ
animism—সর্বপ্রাণবাদ
animistic—সর্বপ্রাণবাদী
assimilation—আত্তীকরণ
canine (tooth)—ছেদক দাঁত
climax vegetation—চরম উদ্ভিজ্জ
clustered—পুঞ্জীভূত
criterion—নির্ণায়ক
cuniform—কীলকাকার
dialect—উপভাষা
diffusion—প্রসারণ, ব্যাপন
domestication—গার্হস্থ্যকরণ, গৃহপালিতকরণ
ecology—বাস্তব্য, বাস্তব্যবিদ্যা
environmentalism—পরিবেশবাদ
ethnocentric—জাতিকেন্দ্রিক
ethnologist—জাতিতত্ত্ববিদ
expansion diffusion—সম্প্রসারণ-শীল প্রসারণ
functionalism—ব্যবহারিকতা
hierarchical—আনুক্রমিক
hieroglyph—চিত্রলিপি
homo erectus—ঋজু মানব
homogeneity—সমসত্ত্বতা
incisor—কর্তক দাঁত
interaction—মিথস্ক্রিয়া
landscaps—ভূদৃশ্য
log house—গুঁড়িগৃহ
migration—প্রচরণ
motor actions—অঙ্গসঞ্চালক ক্রিয়া
paleo-linguist—প্রত্নভাষাবিদ
paleontologist—প্রত্নতত্ত্ববিদ
possibilism—সম্ভাবনাবাদ
predatory—লুণ্ঠনজীবী
race—বর্ণ
radial—অরীয়
relocation diffusion—পুনঃস্থাপিত প্রসারণ
retrospective—ভূতাপেক্ষ
settlement—জনপদ
spatial—পারিসরিক
survival—উদ্‌বর্তন
theocratic—দিব্যতান্ত্রিক
trait—প্রলক্ষণ
transitional—পরিবর্তনশীল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসীমা

সাংস্কৃতিক ভূগোলের সূচনা হয়েছিল গত শতাব্দীতে ইউরোপে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পঞ্চাশ বছরে এর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ ঘটে। যাঁরা সাংস্কৃতিক ভূগোলের চর্চা করে থাকেন, তাঁরা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে, এই শাস্ত্রের একটি সহজবোধ্য সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ সাংস্কৃতিক ধারণাসমূহ প্রয়োগ করে ভূপৃষ্ঠের সকল মানবসৃষ্ট উপাদানের পারিসরিক (Spatial) বিন্যাসের ব্যাখ্যা করে থাকেন। অর্থাৎ এই পটভূমিতে বলা যেতে পারে যে, সাংস্কৃতিক ভূগোল হ'ল ভৌগোলিক পঠনপাঠনে সাংস্কৃতিক ধারণাসমূহের প্রয়োগ। সাংস্কৃতিক ধারণা নৃতত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়, অবশ্য সেক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ থাকে ভিন্ন। সাংস্কৃতিক ভূগোলে সংস্কৃতির নিজস্ব চরিত্র সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য বা ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা থাকে না, সেখানে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ধারণা প্রয়োগ করে ভূপৃষ্ঠে মানবসৃষ্ট রূপের উপলব্ধি করা হয়। তবে একথাও ঠিক যে, সাংস্কৃতিক ভূগোল ও নৃতত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট চারিত্রিক সামঞ্জস্য রয়েছে, যেমন আছে অর্থনৈতিক ভূগোল ও অর্থনীতি বা ভূমিরূপ-বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের মাঝে।

ভূপৃষ্ঠ রূপান্তরকারী সাম্প্রতিকতম শক্তি হচ্ছে মানুষ। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবীর মাটিতে মানুষের কর্মকাণ্ডের ছাপ এতই ব্যাপক যে, মানুষকে উপেক্ষা করে কোন ভূমিরূপের সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ভূপৃষ্ঠে খোদিত মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল ও তার বিশিষ্ট প্রকাশের সাথে সাংস্কৃতিক ভূগোলের একটি নিজস্ব সম্বন্ধ রয়েছে। সাধারণ ভূগোলের সাথে সাংস্কৃতিক ভূগোলের কোন পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই, সাংস্কৃতিক ভূগোল মূল ভূগোলশাস্ত্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে স্থানিক বা আঞ্চলিক পৃথকীকরণ (areal differentiation) উপলব্ধি করে ও তা ব্যাখ্যা করে, তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ সাংস্কৃতিক ধারণাসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের মাঝে একটি কাঠামোগত মিলের কথা অনেকেই বলে থাকেন। প্রাকৃতিক ভূগোলের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার আঞ্চলিকীকরণ। অনুরূপভাবে, ভূপৃষ্ঠে মানব বসতির প্রকৃতি, মানব বসবাসের ফলাফল ও মানবিক তথা মানব-সৃষ্ট পরিবেশের আঞ্চলিকীকরণ সাংস্কৃতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠী তাদের স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এক একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে তুলেছে এবং এসকল পরিবেশ-ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিষয়-পরিধির অন্তর্ভুক্ত। সাংস্কৃতিক ভূগোল মানুষের কর্ম-কাণ্ডকে অনুবর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিবর্তনশীল, ঠিক তেমনই ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন ঘটেছে ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত মানুষের কর্মকাণ্ড এবং মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ধারার। এই কারণেই সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ মানব কর্তৃক ভূপৃষ্ঠ ব্যবহার একটি বিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে থাকেন। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ কোন অঞ্চলে বসবাস স্থাপনকারী মানবগোষ্ঠীতে মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক পরীক্ষা করে থাকেন এবং সেখানে মানবসৃষ্ট উপাদান সমৃদ্ধ মানবিক পরিবেশের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়াও তাঁরা বিবেচনা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক ভূগোলে কোন মানবগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা হয় না; বরং তাদের যৌথ স্বত্বা পারস্পরিক আদান-প্রদান আপেক্ষিক ক্রমবিকাশ তথা গোটা মানবজাতির সার্বিক মিথস্ক্রিয়া (inter-action) সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ পরীক্ষা করে থাকেন।

সাংস্কৃতিক ভূগোলে মানবজাতির নানা কর্মকাণ্ড, আচরণ বা রীতিনীতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। কোন একটি বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেক্‌নলজি কোথায় ও কোন্ পরিবেশে উৎপত্তি লাভ করেছিল বা ঐ প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভবের ফলে মানুষের জীবনধারায় ও সামগ্রিক পরিবেশে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছিল, এ সকল প্রশ্ন সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ জিজ্ঞাসা করেন ও সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাঁরা আরও জানতে চান যে কোন বিশেষ একটি প্রযুক্তিবিদ্যা কোন সমাজে উদ্ভব হওয়ার পর তা প্রসারণের মাধ্যমে অন্য সমাজে প্রবেশ করেছে কি না এবং করে থাকলে তা সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন এনেছে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী পৃথিবীকে

www.pathagar.com

ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং তাদের নিজস্ব প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে তারা নিজ নিজ পরিবেশকে গড়ে নেয়। প্রতিটি মানবগোষ্ঠির কৃষ্টি বা সংস্কৃতির নিজস্ব একটি চারিত্রিক পরিচয় থাকে এবং এসকল সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার রূপ ও কাঠামো সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিবেচ্য বিষয়।

সাংস্কৃতিক ভূগোলে ভূপৃষ্ঠে পরিস্ফুট মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলাফলকে একটি দীর্ঘকালীন দৃষ্টি থেকে দেখা হয়। এই দীর্ঘকালীন সময়টি সত্যিই দীর্ঘ, অর্থাৎ সহস্রাধিক বছর ধরে কোন স্থানে মানুষ তার প্রভাব বিস্তার করে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করেছে, সাংস্কৃতিক ভূগোল তা পর্যবেক্ষণ করে এবং তার ব্যাখ্যা দেয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলাফল বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক ভূগোলের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হ'ল তুলনামূলক, যার ফলে সারা পৃথিবীর জন্য একটি ব্যাপক চিত্র পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ প্রায়ই মানুষের নির্মিত নানা বস্তু, যেমন কোদাল, কোন বিশেষ জাতীর শস্য, অথবা বিভিন্ন অপার্থিব সাংস্কৃতিক উপাদান যথা বিবাহ প্রথা, সাম্প্রদায়িক সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। এ সকল সাংস্কৃতিক উপাদান বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, বিবর্ধন, মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা ও ভূমি বা পরিবেশ ব্যবহারে মানুষের প্রক্রিয়াগত প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ তাঁদের পেশা অনুসরণ করতে গিয়ে অন্যান্য সহজাত সমাজ-বিজ্ঞানের কৌশল, উপাত্ত ও দৃষ্টিকোণের সাহায্য নিয়ে থাকেন; কারণ মূলতঃ সাংস্কৃতিক ভূগোলর মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত সকল সংঘবদ্ধ মানব বা সমাজ-গোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি।

উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবিক পরিবেশ মানুষের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের প্রভাবে চিত্রিত ও সমৃদ্ধ। মানুষের কর্মকাণ্ডের এসকল প্রভাব তার নির্মিত বাসগৃহ, কর্ষিত জমি, সড়ক ব্যবস্থা, কলকারখানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বসবাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত জনপদ মানবিক পরিবেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ। এবং একটি জনপদ উৎপত্তির পেছনে সেখানকার স্থানিক প্রকৃতি, সময় ও বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। সাংস্কৃতিক ভূগোল তাই ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের আঞ্চলিক বিস্তারণ বিশ্লেষণ করে। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন,

www.pathagar.com

"কোথায়", এবং পরে "অবস্থানের অর্থ কি"। এ দুটি প্রশ্নের মাধ্যমে চূড়ান্ত "কেন"র উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

সাংস্কৃতিক ভূগোল মানবসৃষ্ট সকল প্রকার অবয়ব আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ বাড়ীঘর, বিদ্যুৎ লাইন, বিমান বন্দর বা রেলপথের উল্লেখ করা যায়। এসকল উপাদান উৎপাদনশীলও হতে পারে আবার অনুৎপাদনমুখীও হতে পারে। এছাড়া মানুষ উদ্ভিদ ও পশুকুলেও নানা রূপান্তর ঘটিয়েছে; যেমন শস্যচাষ, পশুর গৃহপালিতকরণ ও নিয়ন্ত্রিত প্রজনন বা কৃত্রিম উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজের উদ্ভব। এসকল ঘটনাও সাংস্কৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। অপরদিকে যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতিকে তার ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পন্ন করেছে, যেমন কোন জীবজন্তুর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, অগ্নিসংযোগের দ্বারা বনজঙ্গল বা তৃণভূমির বিনাশ, অথবা অত্যধিক পশুচারণের ফলে প্রতিষ্ঠিত চরম উদ্ভিজ্জের (climax vegetation) ধ্বংস। সাংস্কৃতিক ভূগোল মানুষের এসকল বিনাশকারী কর্মকাণ্ডেরও বিশ্লেষণ করে।

সাংস্কৃতিক ভূগোলের ক্রমবিকাশ

ভূগোলশাস্ত্রে পরিবেশবাদের প্রাধান্য বহু দিনের। এই মতবাদে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের দাসরূপে বিচার করা হয়। কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রে মানুষ তথা সংস্কৃতির গুরুত্ব সব সময়ই অস্বীকৃত ছিল, একথাও সত্য নয়। আধুনিক ভূগোলশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—আলেকজাণ্ডার ফন্ হুমবোল্ট (Alexander Von Humboldt, ১৭৬৯-১৮৫৯ খ্রীঃ)—মূলতঃ দক্ষিণ আমেরিকার ভূমিরূপ, জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ নিয়ে গবেষণা করে থাকলেও তিনি সেখানকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন ও সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আরেকজন জার্মান ভূগোলবিদ—কার্ল রিটার (Karl Ritter, ১৭৭৯-১৮৫৯ খ্রীঃ)—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভূদৃশ্য গঠনে সংস্কৃতির প্রভাবকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভূগোলশাস্ত্রে পরিবেশবাদ ধারার প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকজন ভূগোলবিদ মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের

www.pathagar.com

পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ভূগোলের জন্ম হয়েছে। পরিবেশবাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত হচ্ছেন ফ্রিডরিস রাটসেল (Friedrich Ratzel, ১৮৪৪-১৯০৪ খ্রীঃ)। রাটসেল একজন জার্মান ভূগোলবিদ ও জাতিতত্ত্ববিদ (ethnologist)। তিনি প্রথম জীবনে পরিবেশবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই মতবাদে যুক্তির অসারতা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। রাটসেল ভূগোলশাস্ত্রে ভূমিরূপ ব্যাখ্যার আতিশয্যে লুপ্তপ্রায় মানবিক উপকরণটি সংযোজন করেন। এটাই রাটসেলের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব এবং তা পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক ভূগোলের সূত্রপাতের সুযোগ করে দেয়।

সাংস্কৃতিক ভূগোলের অন্যতম প্রভাবশালী প্রবক্তা পল ভিদাল দ্য লা ব্লাশ (Paul Vidal de la Blache, ১৮৪৫-১৯১৮খ্রীঃ)। সাংস্কৃতিক ভূগোলের জন্ম, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠালাভে ভিদালের অবদান অপরিসীম। ভিদালের মতে মানুষের কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত মানুষ নিজেই নিয়ে থাকে এবং তা প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। একটি মানবগোষ্ঠী তার নিজস্ব সংস্কৃতির পটভূমিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছে ও নিজ প্রয়োজনমত গড়ে নিচ্ছে। ভিদালের এই চিন্তাধারাই অর্থাৎ মানুষ তথা সংস্কৃতির উৎকৃষ্টতা সাংস্কৃতিক ভূগোলের ভিত্তি। আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক ভূগোলের রূপরেখা প্রণয়নে আরেকজন ফরাসী ভূগোলবিদ—জঁা ব্রুনে (Jean Brunne)—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানবিক ভূগোলে শৃঙ্খলা ও শ্রেণীবিন্যাস আনয়ন করেন। তাঁর মতে মানবিক বা সাংস্কৃতিক ভূগোলের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মানুষের কর্মকাণ্ডের নিদর্শন।

ইউরোপের জার্মানী ও ফ্রান্সে, সাংস্কৃতিক ভূগোলের জন্ম হবার পর তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এই প্রসারণের প্রধান বাহক হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রখ্যাত ভূগোলবিদ কার্ল সাওয়ার (Carl Sauer)। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ "মরফলজি অফ ল্যান্ড্স্কেপ" (Morphology of Landscape) বা 'ভূদৃশ্যের রূপ'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক ভূগোলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ভূগোল শাস্ত্রের সামগ্রিক চিন্তাধারায় সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। সাওয়ার লিখেছেন যে, "পৃথিবীর বুকে মানুষ তার কর্মকাণ্ডের

www.pathagar.com

মাধ্যমে নিদর্শন রেখে যে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য রচনা করেছে, তাই সাংস্কৃতিক ভূগোলের পাঠ্য। এবং আমরা বিভিন্ন ভূদৃশ্যে প্রতিফলিত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পরিবেশের সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি।"

সাম্প্রতিককালে, সাংস্কৃতিক ভূগোলের ধারা ও কৌশলে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু এই শাস্ত্রের মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। সাংস্কৃতিক ভূগোলের অন্যতম মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে "সংস্কৃতি", কারণ মানবসৃষ্ট পরিবেশে মানব সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক ভূগোল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ দ্বারা গঠিত "সাংস্কৃতিক অঞ্চলের" সীমা নির্ধারণ করে এবং ঐ অঞ্চলের পরিবর্তনশীল বিস্তারণ অনুসরণ করে। আবার মানবসৃষ্ট সকল নিদর্শন তালিকাবদ্ধ করে প্রতিটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের জন্য "সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য" রচনা করা হয় এবং তাদের উৎপত্তি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে "সাংস্কৃতিক ইতিহাস" আলোচিত হয়। সবশেষে, সাংস্কৃতিক ভূগোল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কৌশল "সাংস্কৃতিক বাস্তব্য" রূপে আলোচনা করে। উপরে উল্লিখিত পাঁচটি অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু—যথা, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বাস্তব্য—প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক ভূগোলের পরিসীমা নির্ধারণ করে।

সংস্কৃতি (Culture)

সংস্কৃতি মানবসমাজে সাদৃশ্য ও প্রভেদের পরিচায়ক। কোন মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের সাথে সংস্কৃতির বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই; পক্ষান্তরে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী কোন মানবগোষ্ঠীর ধ্যানধারণা, কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সমষ্টিতে সংস্কৃতি রচিত হয়। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানব সমাজকে সুনির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় এবং ঐ ভিত্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর আঞ্চলিকীকরণ করা হয়।

মানবজাতি নিজেদের মধ্যে প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে আলাপ করতে পারে বলেই সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। মানব সমাজে যোগাযোগের প্রধান বাহন ভাষা—নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংস্কৃতির উপর ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশী, কিন্তু আবার অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানও ভাষাকে

www.pathagar.com

প্রভাবিত করে। যাই হোক, একটি সমাজগোষ্ঠীর ভাষা সেই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, কোন সংস্কৃতি একাধিক ভাষা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে; আবার একই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক সংস্কৃতি রূপ নিতে পারে। মানুষের মাঝে মাঝে যোগাযোগ বা তথ্য বিনিময়ের জন্য ভাষা ছাড়া আরও ভিন্নতর বাহনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেমন বিস্ময়সূচক শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, প্রকাশ কৌশল বা অভিব্যক্তি। ঠিক তেমনি ছবি, চিত্র, রূপক হিসাবে ব্যবহৃত প্রতীকচিহ্ন বা বস্তু অনেক সময় ভাষার প্রতিকল্প রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং, স্বেচ্ছায় উচ্চারিত কণ্ঠস্বর থেকে শুরু করে শারীরিক ভঙ্গি, বস্ত্র বা স্থান সবই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

ভূগোলশাস্ত্রে ভাষা ব্যবস্থা, আদর্শ বা সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা পুনর্বৃত্তিকারী ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত আচরণ অধিক তাৎপর্য বহন করে। দৈব-ঘটনা বা আনুষঙ্গিক কারণে মিশ্রিত সাংস্কৃতিক উৎপাদনসমূহ নিয়ে ভূগোলশাস্ত্র অধিক চর্চা করে থাকে। সুতরাং ভৌগোলিক উপায়ে অনুবর্তী আচরণ সকল সময় বিশ্লেষণ করা যায় না। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ অনেক সময় সংস্কৃতির বিভিন্ন "স্তর" বা "পর্যায়" এর কথা উল্লেখ করে থাকেন। এর ফলে সংস্কৃতিকে ভূতাপেক্ষ (retrospective) ও তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। লুপ্ত বা অতীতের সংস্কৃতির ভৌগোলিক রূপায়ণ তাদের সাংগঠনিক ও প্রাযুক্তিক সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব; এবং অনুরূপভাবে কোন সংস্কৃতিতে মানুষের ক্রিয়াকর্মের নঞর্থক (negative) নির্ধারকসমূহ সহজে নির্ণয় করা যায়। কোন ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ত সকল সময় সম্ভব নয়, কিন্তু তারা কি করবে না, তা বলা অধিকতর সহজ। সেজন্যে, নিষিদ্ধ প্রথা, ভূমি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা, বিশেষ কোন খাদ্য পরিহার, উন্নয়ন কাজে সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য কোন সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Culture-Area)

অঞ্চল-নির্মাণ ভূগোলশাস্ত্রের অন্যতম করণীয় লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক ভূগোলেও এর ব্যতিক্রম নেই। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ (trait) এর বর্তমান

www.pathagar.com

ও অতীত বিস্তারণ অনুসন্ধান করা সাংস্কৃতিক ভূগোলের সর্বপ্রথম কাজ। এসকল প্রলক্ষণ বিস্তারণের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ সংস্কৃতিপুষ্ট একটি সমাজগোষ্ঠীর আবাসভূমি রূপে পরিচিত হয়। সেই অঞ্চলের অভ্যন্তরে আপেক্ষিক সমসত্ত্বতা (relative homogeneity) পাওয়া যাবে, কারণ কোন কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সেখানে সমরূপী হওয়ার ফলেই ঐ অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং, অঞ্চল নির্মাণে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদের প্রথম কর্তব্য হবে অনুরূপ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণের অধিকারী মানবগোষ্ঠীর বিস্তারণ নির্ণয় করা এবং তার ভৌগোলিক সীমানা নিরূপণ করা। এ প্রসঙ্গে তিন প্রকার বিস্তারণ অনুসন্ধানের দাবী রাখে। প্রথমতঃ "বিন্দু বিস্তারণ"—যা সাংস্কৃতিক উৎসকেন্দ্র নির্দেশ করে; দ্বিতীয়তঃ "রৈখিক বিস্তারণ"—যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণসমূহ প্রসারণের পথ প্রদর্শিত হয়; এবং তৃতীয়তঃ "আঞ্চলিক বিস্তারণ"—যেখানে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক উপাদানের সমষ্টিতে গঠিত বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্ন অঞ্চল দেখানো হয়। এই তিন প্রকার বিস্তারণ আবার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অধিকন্তু বিন্দু, রেখা বা অঞ্চল বিভিন্ন পর্যায়ে নির্ণয় করার ফলে সাংস্কৃতিক ধারার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়।

সাংস্কৃতিক অঞ্চল নির্ধারণে মূলতঃ দুটি পর্যায়ক্রমিক কাজের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ কোন সমাজগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণসমূহ মানচিত্রের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ সারা পৃথিবীকে কয়েকটি সমরূপী সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এর সাথে কোন একটি বিশেষ প্রলক্ষণের বিভিন্ন সময়কালের বিস্তারণ চিত্রায়িত করে তার প্রসারণ পদ্ধতি জানা যায়। সমগ্র মানবজাতিকে কয়েকটি যৌথ-সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণের ভিত্তিতে গোটা কয়েক মুখ্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাসে সংস্কৃতিসমূহের বিবর্তনমূলক ক্রমবিকাশ বুঝাতে পারে, আবার তাদের মধ্যে উদ্ভব সম্বন্ধীয় (genetic) সম্পর্কও ইঙ্গিত করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের জন্য উভয় প্রকার ব্যাখ্যাদান সাংস্কৃতিক অঞ্চল গঠনের দ্বারা সম্ভব।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য (Cultural Landscape)

সাংস্কৃতিক অঞ্চল সমরূপী বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা এবং ঐ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সকল মূর্ত ভৌগোলিক উপাদানকে সাংস্কৃতিক ভূগোলে "সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য" বলা হয়। ভূদৃশ্যে আমরা সেই সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান দেখতে পাই যা একটি অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল থেকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য বলতে তাই কোন অঞ্চলের মানবসৃষ্ট সকল মূর্ত উপাদানকে বুঝায়। এর মাধ্যমে এক অঞ্চলের ভূদৃশ্যের সাথে অন্য অঞ্চলের ভূদৃশ্যের তুলনা করা যায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষ কতখানি রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে, তাও বিবেচনা করা যায়।

সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যে যেহেতু মানবসৃষ্ট পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সাংস্কৃতিক ভূগোলে তাই প্রাকৃতিক পরিবেশবাদের সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সেখানে বসবাসকারী কোন বিশেষ সংস্কৃতিপুষ্ট সমাজগোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য। এই ভূদৃশ্যে বহু যুগের স্বাভাবিক বিবর্তন ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচলিত মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন পাওয়া যায়। মানুষ ও তার সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট ভূদৃশ্যের সাথে আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু তবুও সেই প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে মানুষের ছাপ পরিস্ফুট থাকে; যেমন, পাহাড়ের ঢালে কর্ষিত জমি, বাঁধ দেওয়া নদী বা মহানগরের ধোঁয়াটে আবহাওয়া। কিন্তু উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি ও বিস্তারণে মানব-প্রভাবের নিদর্শন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকটরূপে প্রকাশ পায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মানুষ তৃণভূমি ও অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করেছে। আদিম ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে, তা প্রধানত ক্ষয়প্রাপ্ত ও শক্তিহীন। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর সাথে নির্দিষ্ট উদ্ভিজ্জ ব্যবস্থার বিস্তারণ দেখা যায়। অপরদিকে প্রত্যেক দেশের কৃষিজমিতে নানা প্রকার কৃত্রিম, পরিবেশের নমুনা পাওয়া যায়; যেমন, ফলের বাগান, খাদ্যশস্য ক্ষেত্র, জমির রক্ষার্থে দেওয়া বেড়া (fence), সেচখাল, খামার ঘর, বসতবাটি ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের এসকল উপাদানে ঐ অঞ্চলের সমাজগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনধারা বা genre de vie রূপায়িত হয়। অনুরূপভাবে, স্থাপত্যশিল্প, যান্ত্রিক দ্রব্যাদি, উৎপাদিত শস্য,

www.pathagar.com

গৃহপালিত পশু, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, হাতিয়ার (tool) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর সংস্কৃতি উন্মোচিত হয়।

যে সকল উপাদান নিয়ে ভূদৃশ্য গঠিত হয়, তাদের সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করা যায়: যেমন, কোন্‌টা প্রাচীন আর কোন্‌টা সাম্প্রতিক? কোন্‌টা আদর্শস্বরূপ (typical) আর কোন্‌টা ব্যতিক্রম ধর্মী? কোন্‌টা পরিকল্পিত আর কোন্‌টা দৈবঘটিত? কোন্‌টা ক্ষণকালীন ও কোন্‌টা স্থায়ী? বা কোন্‌টা প্রকৃতি-প্রদত্ত ও কোন্‌টা মানবসৃষ্ট? এ সকল প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জীবনধারার বিস্তারিত রূপরেখা জানা যায় এবং তার ভৌগোলিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ উপলব্ধি করা যায়। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ ভূদৃশ্যে নিহিত বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহ সংগ্রহ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনর্গঠন, সাংস্কৃতিক তুলনা এবং প্রাকৃতিক ও জৈবিক যুক্তির সমন্বয়ে ধাপে ধাপে একটি সংস্কৃতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ভূগোলশাস্ত্রের রীতিসিদ্ধ কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন। এসকল কৌশলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উপাদানের একক ও যৌথ মানচিত্রায়ণ, বিভিন্ন ভিত্তিতে রচিত অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ ও তুলনামূলক বিচার, প্রসারণ ও চলাচলের পথ চিত্রায়ণ, প্রাকৃতিক ও জৈবিক অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন গবেষণা প্রক্রিয়া।

সাংস্কৃতিক ইতিহাস (Culture-History)

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালের মানবগোষ্ঠী দ্বারা রচিত হয়নি। একটি ভূদৃশ্যের বিবর্তন পুঞ্জিত ও ক্রমান্বয়িকভাবে ঘটে—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের একটি ইতিহাস থাকে। এই ইতিহাস বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার রূপ জানতে পারি। এই কারণে সাংস্কৃতিক ইতিহাস সাংস্কৃতিক ভূগোলের অন্যতম মুখ্য বিষয়বস্তু। সংস্কৃতির অনুবর্তিতা বা ধারাবাহিকতা নির্ণয়ের ফলে সংস্কৃতির উৎস ও বিস্তারণ প্যাটার্ণ প্রকাশ পায়।

সাংস্কৃতিক ভূগোলে কোন সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁদের খননকাজ চালিয়ে অতীতকালের সংস্কৃতির অবস্থান ও বিস্তারণের বহু মূল্যবান তথ্য আমাদের

www.pathagar.com

ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা মাটির নীচ থেকে বহু প্রকার প্রাচীন হাতিয়ার ও দ্রব্য সামগ্রী উদ্ধার করে থাকেন এবং যেহেতু ঐ সকল দ্রব্য অতীতের কোন বিশেষ পরিবেশে নির্মিত হয়েছিল, ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলির গুরুত্ব অনেক। অবশ্য একথাও ঠিক যে, অতীতের দ্রব্য সামগ্রী বা হাতিয়ার পরীক্ষা করে যে অনুমিতি (inference) করা যায়, তাতে গাণিতিক সূক্ষ্মতা থাকে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ বা দ্রব্য কোন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে, না তা ভিন্ন এলাকা থেকে প্রসারণের ফলে এসেছে। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা একাধিক স্থানে প্রাপ্ত কোন দ্রব্যসামগ্রী বা হাতিয়ারের বৈজ্ঞানিক কাল নিরূপণের (dating) মাধ্যমে স্বতন্ত্র উদ্ভাবন ও প্রসারণের বিতর্কের মীমাংসা করতে পারে। স্বতন্ত্র উদ্ভাবন ও প্রসারণের সমস্যা প্রজননবিদ্যার (genetics) মাধ্যমেও অনুসন্ধান করা যায়। দুটি অঞ্চলে প্রাপ্ত কোন কর্ষিত শস্য বা গৃহপালিত পশু যদি জন্মগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে মনে করা যেতে পারে যে তাদের উদ্ভব ও বিবর্তন স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে। অপরদিকে, তাদের মাঝে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলে বুঝতে হবে যে, প্রাচীনকালে ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় পার্শে মিষ্টি আলু চাষের প্রচলন থেকে অনুমিত হয় যে কলম্বাসের পূর্বেই আমেরিকা ও অবশিষ্ট পৃথিবীর মাঝে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ছিল।

প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া আরও চারটির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। সেগুলি হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব, স্থান-নাম (place names), লিখিত দলিল-পত্র ও পুরুষানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত মৌখিক তথ্যাবলী। কোন ভাষার শব্দসম্ভার বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, ঐ ভাষার সাথে কোন ভিন্ন ভাষার যোগাযোগ ঘটেছে কিনা বা তার প্রভাব কতখানি। প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানের নামকরণের একটি ইতিহাস থাকে। এসকল নাম ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজগোষ্ঠীর চরিত্র নির্দেশ করে। আবার মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রচলিত লোকগাঁথা, গল্প, রূপকথা, সঙ্গীত ও লোকাচার একটি সমাজগোষ্ঠীর বহু সাংস্কৃতিক তথ্য প্রকাশ করে এবং তার মাঝে একটি কালক্রমও নিরূপণ করা যায়। সবশেষে, লিখিত দলিলপত্র সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র। অবশ্য এ জাতীয় প্রামাণিক তথ্য

www.pathagar.com

সুদূর অতীত সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে পারে না; এর পরিধি মাত্র গত কয়েক শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ।

সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রধানত চার প্রকার তথ্য প্রকাশ করে: (ক) কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের উৎপত্তির সময় ও স্থান; (খ) সেগুলি বিস্তারের পথ, সময় ও ধরন; (গ) ভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহের বিস্তারণ; এবং (ঘ) ভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। এই কাজ সম্পাদনে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রত্নভাষাবিদ (paleo-linguist), জাতিতত্ত্ববিদ (ethnologist) ও কৃষিবিদের নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে থাকেন।

সাংস্কৃতিক বাস্তব্য (Cultural Ecology)

ভূদৃশ্য তথা সমগ্র পরিবেশের গঠন ও পরিবর্তন সাধনে যে সকল প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে, সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ প্রাকৃতিক, জৈবিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও ধারণা প্রয়োগ করে তা অনুসন্ধান করেন। সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বিগত সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও ভূদৃশ্যের কাঠামো জানা সম্ভবপর হতে পারে। "কোথায় কি হয়েছিল?"—এই প্রশ্নের উত্তর সাংস্কৃতিক ইতিহাস দিতে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের আলোচনা সেখানেই শেষ হয় না, কারণ ভূদৃশ্যের কোন্ পদ্ধতি বা কি ক্রিয়াকর্মের প্রভাবে রচিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা বাকী থাকে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল সম্বন্ধ ঘটনার ধারাবাহিকতার সাথে, কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতায় যে প্রক্রিয়া বা কার্যধারা কাজ করে, সাংস্কৃতিক বাস্তব্য তা আলোচনা করে। সকল ভূগোলবিদ কোন ভূদৃশ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সময় ভূদৃশ্যের বৈশিষ্ট্য গঠনে যে সকল প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল, তার উল্লেখ অবশ্যই করে থাকেন। সাংস্কৃতিক বাস্তব্য এসকল প্রক্রিয়ার ভূমিকা আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক বাস্তব্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের নিখুঁত মূল্যায়ন থেকে কাজ শুরু করে। যেসকল প্রশ্নের উত্তর সেখানে অনুসন্ধান করা হয়, সেগুলি হচ্ছে, যেমন, কোন্ রীতি ও প্রথার সাথে কি প্রকার ভূদৃশ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; কোন্ ভূদৃশ্য বিকাশের সাথে কি জাতীয় মানবিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়; কোন্ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সাথে কি

www.pathagar.com

প্রকার ভূমি ও সম্পদ ব্যবহার পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়; কোন্ ধরনের সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের সাথে কোন্ জীবিকায় যোগাযোগ আছে ইত্যাদি। উপরোক্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ বিশুদ্ধভাবে কিছু প্রমাণ করে না দিলেও এর সাহায্যে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের চরিত্র বুঝতে পারা যায়।

সাংস্কৃতিক বাস্তব্যের অন্যতম ধারা হচ্ছে কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করা। যেমন, কোন সাধনী বা প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব দরুন কোন অরণ্যাঞ্চল মানুষের দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল; সেখানে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি ভূদৃশ্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রভাবিত করেছে। সাংস্কৃতিক বাস্তব্যের অপর একটি ধারা হ'ল বাস্তব প্রক্রিয়াসমূহের সনাক্তকরণ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। কোন কৃষিজীবী সমাজগোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদের ভূমি কর্ষণ করার রীতিনীতি, পানিসেচ ব্যবস্থাদি, মৃত্তিকা উর্বরতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা বা কোন কাজের দ্বারা ভূমি অনুর্বর হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সকল কার্যকরী প্রক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত হয়।

সাংস্কৃতিক বাস্তব্যের দৃষ্টিকোণ সাংস্কৃতিক ভূগোল ও নৃতত্ত্বের মাঝে এক যোগসূত্র স্থাপন করেছে। উভয় শাস্ত্রের বক্তব্য অনেকেই পরিপূরক বলে মনে করেন। তার ফলে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ নৃতত্ত্ববিদদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানব সংস্কৃতি বিশ্লেষণে লাভবান হয়েছেন।

সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ (Cultural Geographer)

মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন শাখার সাথে উপরে আলোচিত সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক ভূগোলকে এখানে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে পাঁচটি পৃথক কিন্তু পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিষয়-বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। এর যে কোন একটি পঠনপাঠনই সাংস্কৃতিক ভূগোল। এই পাঁচটি বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, এর কোন একটির আলোচনা করলেই সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ অপর বিষয়বস্তুসমূহের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগণ সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য বিশ্লেষণ করার সময় তার ইতিহাস, প্রক্রিয়া ও কার্যধারা, আঞ্চলিক বিস্তারণ তথা গোটা সংস্কৃতির প্রকৃত বিচার করে থাকেন।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ভূগোল ভূগোলশাস্ত্রের একটি অংশ। সুতরাং, পৃথিবীই এর মূল লক্ষ্যবস্তু এবং ভূগোলশাস্ত্রের কৌশল ও পদ্ধতি সাংস্কৃতিক ভূগোল-বিদরাও ব্যবহার করে থাকেন। কোন ভূগোলবিদ যদি কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চল বা সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য বিশ্লেষণ করেন, তিনি সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ রূপেই পরিচিত হবেন, কারণ সংস্কৃতির প্রভাববিশিষ্ট পৃথিবী তাঁর পাঠ্য। সংস্কৃতির ধারণা ও চিন্তাধারা প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ মানুষের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে পাঁচটি প্রশ্ন করেন; যথা, কে? কোথায়? কি? কখন? ও কিভাবে? এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বাস্তব্য আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই সাধারণভাবে বলা হয় যে, সংস্কৃতির ভৌগোলিক অধ্যয়নের দ্বারা মানবসৃষ্ট পরিবেশের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃতি ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু সংস্কৃতি। সংস্কৃতি নিয়ে নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে এবং তাঁরা সংস্কৃতির অসংখ্য সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন। সংস্কৃতির পারিসরিক (Spatial) প্রকাশ বা প্রতিফলন ভূগোলবিদের আলোচ্য বিষয়। ভূগোলে যেমন ভূপ্রাকৃতিক জলবায়ু সংক্রান্ত বা নগরীয় অঞ্চল গঠন করা হয়, তেমনি সাংস্কৃতিক অঞ্চলও গঠন করা সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃতির ভিত্তিতে আঞ্চলিকীকরণের পূর্বে সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সংক্ষেপে, মানুষের জীবনধারার সার্বিক রূপায়ণকে সংস্কৃতি বলা যায়। কিন্তু এরূপ সরল সংজ্ঞা দ্বারা সংস্কৃতির প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জীবনধারা বলতে একটি মানবগোষ্ঠী বাস্তবে যে উপায়ে জীবন অতিবাহিত করছে, বা যে উপায়ে করতে ইচ্ছুক, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা চাই। নৃতত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি এবং তার ফলে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রণয়নে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বর্তমানে সাধারণতঃ সবাই একমত যে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের "অর্জিত আচরণ (acquired behaviour)—যে আচরণ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং বংশানুক্রমে বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। মানুষের আদর্শ, বিশ্বাস সামাজিক সংগঠন, প্রাযুক্তিক বিদ্যা, মূল্যবোধ, বস্তুগত সম্পদ বা তার সৃষ্ট বস্তু ইত্যাদি সবই মানব সংস্কৃতির অংশ।

সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞায় সময়, ঐতিহ্য এবং বস্তুগত ও নির্বস্তুক দৃষ্টিকোণের ইঙ্গিত থাকে। এতে আরও উল্লেখ থাকে যে, সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রলক্ষণ একত্রিত করে একটি গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের একত্রীকরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঞ্চল নির্মাণ সম্ভব। সংস্কৃতি একটি মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনধারার রূপায়ণ—তাদের সকল কাজের ধারা, কাজের ফল এবং আচরণের সমষ্টি নিয়ে তাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়, অর্থাৎ ঐ মানবগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি শিক্ষণের মাধ্যমে বংশানুক্রমে পরিবাহিত করেছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ তার নিজ সমাজের সংস্কৃতি শিক্ষণের

www.pathagar.com

মাধ্যমে অর্জন করে ; অর্থাৎ কোন সংস্কৃতি জৈব উপায়ে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত নয়। ভাষা, ধর্ম, সঙ্গীত, আচার, প্রথা, কুসংস্কার, ভোজনপ্রণালী—এ সবই সংস্কৃতির অঙ্গ। সুতরাং, সংস্কৃতি বলতে আমরা কোন মানবগোষ্ঠীর বিশ্বাস, মূল্যবোধ (রাজনৈতিক, ধর্মীয়), সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান (আইন, শিক্ষা, শাসন) এবং প্রযুক্তি (দক্ষতা, হাতিয়ার) ইত্যাদি বুঝি। পারস্পরিক যোগাযোগ পদ্ধতি, নিজ সম্পদের প্রত্যক্ষণ ও ব্যবহারের ধারা, তাদের স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। অবশ্য ভূপৃষ্ঠকে কোন মানবগোষ্ঠী কিভাবে ব্যবহার ও সংগঠিত করে, ভূগোলবিদের নিকট সেটাই সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

সংস্কৃতির সমন্বয়ন

মানুষ অসংখ্য প্রকার আচরণে সমর্থ হতে পারে, কিন্তু কোন মানবগোষ্ঠী সকল প্রকার আচরণের দৃষ্টান্ত দেয় না। সময়ের সাথে সাথে যখন কোন মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি গড়ে উঠে, তখন ঐ সংস্কৃতি বহু আচরণ উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যেক সংস্কৃতির নিজস্ব একটি পরিচয় এবং আশা আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট রূপ থাকে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক সংস্কৃতির সদস্যদের আচরণে একটি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রয়োজন হয়। গোটা মানবসমাজে প্রচলিত অগণিত আচরণের মধ্যে নিজ প্রয়োজন ও মূল্যবোধ অনুসারে প্রত্যেক সংস্কৃতি তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা বাছাই বা মনোনয়নের মাধ্যমে সৃষ্টি করে। সুতরাং, মানবসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নীতি বাছাই বা মনোনয়ন। বলাবাহুল্য, সংস্কৃতির মনোনয়ন ব্যবস্থা কোন খামখেয়ালী বা এলোমেলোভাবে পরিচালিত হয় না। মানুষ ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে কোন সংস্কৃতির কতিপয় স্বীকার্য বা মৌলিক নীতির পটভূমিতে মনোনয়ন বা বাছাই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিনিয়ত একটি সংস্কৃতি বিভিন্নতর সাংস্কৃতিক আচরণ মনোনীত করে থাকে এবং সেই সংস্কৃতির চিন্তাধারা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও প্রয়োজন ঐ মনোনয়নকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, সংস্কৃতির আচরণমালা একটি অসঙ্গত বা বিচ্ছিন্ন তালিকা নয়, বরং প্রত্যেক সংস্কৃতির সকল আচরণ একটি স্বকীয় গ্রন্থিতে সমন্বিত এবং প্রত্যেক সংস্কৃতি একটি সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত প্যাটার্নের পরিচয় দেয়।

www.pathagar.com

সংস্কৃতি বিভিন্ন প্রলক্ষণের সমষ্টিতে সৃষ্ট, কিন্তু প্রলক্ষণসমূহ অপেক্ষা তাদের সমন্বিত চিত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সংস্কৃতিকে অর্জিত আচরণের একটি সমন্বয়কারী ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন দুটি সংস্কৃতির অভিন্ন প্রলক্ষণ থাকতে পারে, কিন্তু ঐ দুই প্রলক্ষণ সমষ্টির অভ্যন্তরে পারস্পরিক সমন্বয়ন ভিন্নতর এবং সেহেতু দুটি পৃথক সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ একটি সংস্কৃতির স্বকীয় পরিচয় তখনই ফুটে উঠে যখন বিভিন্ন প্রলক্ষণ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ও সমন্বিত হয়।

সংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রকৃতি

প্রত্যেক সংস্কৃতি যখন অসংখ্য প্রলক্ষণের সমন্বিত সমষ্টিতে গঠিত, তখন একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে গোটা সংস্কৃতির সাথে তার বিভিন্ন অংশের নিজস্ব ও বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রলক্ষণের নিজস্ব আকৃতি বা পদ্ধতি আছে, যেমন একটি লাঙ্গল, একটি হাঁড়ি, একটি নৌকা বা বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন আচার অনুষ্ঠান বা সামাজিক আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি। উপরোক্ত কোন প্রলক্ষণেরই অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। সার্বিক জীবনধারা রচনায় প্রতিটি প্রলক্ষণের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। ঐ সকল প্রলক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রভাব সংস্কৃতির গাঠনিক রূপরেখা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গোটা সংস্কৃতিতে প্রতিটি প্রলক্ষণ যে অবদান রাখে, তাকে ঐ প্রলক্ষণের ব্যবহার (function) বলা হয়। সুতরাং, একটি লাঙ্গলের আকার ছবিতে ও পরিমাপে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু তার প্রকৃত ব্যবহার হচ্ছে ঐ সমাজগোষ্ঠীর খাদ্য উৎপাদনে। অনুরূপভাবে, আইন প্রয়োগ দ্বারা কোন সংস্কৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সমাধানে ঐ সংস্কৃতির আইন ব্যবস্থার ব্যবহার প্রকাশ পায়। সংস্কৃতির এই ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ তথা সাংস্কৃতিক ব্যবহারিকতা (functionalism) সংস্কৃতির গতিশীলতার সাক্ষ্য দেয়। সংস্কৃতির ব্যবহারিকতা একটি মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন আচার, প্রথা ও অভ্যাসাদির কেবলমাত্র বর্ণনা দেওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও অনেক বেশী তথ্য প্রকাশ করে। প্রলক্ষণসমূহের ব্যবহার বিশ্লেষণ করার ফলে গোটা সংস্কৃতি তথা জীবনধারার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সংস্কৃতির গাঠনিক অঙ্গসমূহ

যে সকল আচরণের সমষ্টিতে সংস্কৃতির সৃষ্টি, সকল আচরণ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের আচরণ ও প্রলক্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক মৌল উপাদান (culture elements)। কোন মানবগোষ্ঠীতে প্রচলিত সকল আচার, প্রথা ও তার বস্তুগত প্রতিফলন ঐ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মৌল উপাদান গঠন করে। আবার পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন, আচরণ ও প্রলক্ষণের সমষ্টিকে সংস্কৃতির যৌগিক উপাদান (culture complex) বলে। যেমন, লাঙ্গল দিয়ে ভূমি চাষ করা একটি মৌলিক আচরণ, কিন্তু ধান উৎপাদনে জমিতে বিভিন্ন প্রকার তৎপরতার সমষ্টি কৃষিকাজের একটি যৌগিক সংস্কৃতির উদাহরণ। পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল যৌগিক উপাদান পরস্পরের সাথে বিজড়িত হয়, সে সকল যৌগিক উপাদান একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা (culture system) গঠন করে। যেমন, ধান উৎপাদন, বণ্টন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল তৎপরতার সমষ্টিতে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়।

সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আচার, প্রথা, আচরণ ও প্রলক্ষণ ঐ সংস্কৃতির সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য হয় না। প্রযোজ্যতার পরিসীমা অনুসারে সংস্কৃতির সকল আচরণকে সার্বজনীন (universals), বিকল্প (alternatives) ও বিশিষ্ট (specialties)—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। সংস্কৃতির বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিকোণের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। সংস্কৃতির সকল আচরণ সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য হয় না। যে সকল আচরণ কোন সমাজ গোষ্ঠীর সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য এবং যার পালনে কোন ব্যতিক্রম নেই, সংস্কৃতির সেই অংশকে 'সার্বজনীন' আখ্যা দেওয়া হয়। হত্যা বা ছুরি করার বিরুদ্ধে সমাজে যে আইন ব্যবস্থা আছে, তা সার্বজনীন আচরণের একটি দৃষ্টান্ত।

প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই এমন অনেক আচরণ পাওয়া যায় যা সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং ঐ সমাজগোষ্ঠীর মানুষের সম্মুখে বিকল্প বহু আচরণের মধ্য থেকে বাছাই বা মনোনয়নের সুযোগ থাকে। এরূপ আচরণসমূহকে "বিকল্প" নামে অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে একটি কৃষক তার শস্যের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার জন্য রাসায়নিক

www.pathagar.com

সার অথবা পশুজাত সার ব্যবহার করতে পারে; অর্থাৎ বিকল্প আচরণে সমাজের প্রতি সদস্যের নিজ পছন্দ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন তৎপরতার সুযোগ রয়েছে।

সংস্কৃতির যে সকল আচরণ কোন সমাজগোষ্ঠীর কেবলমাত্র এক বিশেষ গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাকে "বিশিষ্ট" আচরণ বলা হয়। মহিলাদের কোন বিশেষ কেশসজ্জা বা সূত্রধরের নিকট সিরিশ-কাগজের ব্যবহার বিশিষ্ট আচরণ ও প্রলক্ষণের দৃষ্টান্ত।

সংস্কৃতির দ্বৈত রূপ

সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ একটি প্রশ্ন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংস্কৃতি বলতে আমরা মানুষের বাস্তব বা প্রকৃত জীবনধারা বুঝি, না তার আকাঙ্ক্ষিত ও আদর্শ জীবনযাত্রা বুঝাই। এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতিকে বাস্তব (real) ও আদর্শ (ideal) সংস্কৃতি নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কোন মানবগোষ্ঠীতে যে আচরণ ও প্রলক্ষণ বাস্তবে দেখা যায় ও পালিত হয়, তাকে বাস্তব সংস্কৃতি বলে। মানুষ বাস্তবে যা করে, সেটাই বাস্তব সংস্কৃতি। অপরদিকে যা করা উচিত বলে সবাই বিশ্বাস করে, সেটা আদর্শ সংস্কৃতি। বাস্তবে পালিত হোক বা না হোক, যে সকল আচরণ বাঞ্ছনীয় বলে সর্বজনস্বীকৃত, তাকে আদর্শ সংস্কৃতি বলে। আদর্শ সংস্কৃতির মান ও রূপ সমাজের সাধারণ মঙ্গলের পটভূমিতে নির্ণীত হয়, কিন্তু ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আচরণ আদর্শচ্যুত হয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রকাশ্য (overt) ও অপ্রকাশ্য (covert) আচরণ সংস্কৃতির আরেকটি দ্বৈত রূপ। প্রকাশ্য আচরণ অঙ্গসঞ্চালক ক্রিয়া (motor actions) দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং এর বাহ্যিক প্রকৃতির জন্য সহজেই তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। অপ্রকাশ্য আচরণ প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না কারণ এই আচরণ মানুষের অন্তরে তার চিন্তাধারার মধ্যে সম্পাদিত হয়। সুতরাং অপ্রকাশ্য সংস্কৃতি মানুষের চিন্তায় সীমাবদ্ধ এবং তা প্রকাশ্য সংস্কৃতিতে তখনই রূপান্তরিত হবে যখন তা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতি বস্তুগত (material) এবং নির্বস্তুক (non-material) হতে পারে। প্রকাশ্য আচরণের ফলে বস্তুগত সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। স্পর্শ দ্বারা বোধগম্য এমন সকল বস্তুকে বস্তুগত সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করা হয়; যেমন, বাসগৃহ, লাঙ্গল, বর্শা, নলকূপ ইত্যাদি। নির্বস্তুক সংস্কৃতি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার আচরণের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু তা স্পর্শদ্বারা বোধগম্য নয়; যেমন, সঙ্গীত, বিবাহের আচার অনুষ্ঠান, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি। বস্তুগত সংস্কৃতির মাধ্যমে কোন সংস্কৃতির প্রকৃত ও বিস্তারিত চরিত্রের রূপ জানা যায়। সাংস্কৃতিক ভূগোলেও বস্তুগত সংস্কৃতির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু শুধু বস্তুগত সংস্কৃতি মূল সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুগত সংস্কৃতি নির্বস্তুক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

সহজাত সাংস্কৃতিকরণ ও সদৃশকরণ (Acculturation and Assimilation)

কোন মানবগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না। পারস্পরিক যোগাযোগ আধুনিক জগতের নিয়ম; এমন কি গোঁড়া জাতিকেন্দ্রিক (ethnocentric) সমাজও আজকাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করে না। পারস্পরিক সংযোগের ফলে এক সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি হতে বিভিন্ন প্রলক্ষণ গ্রহণ করে, আবার একই সাথে নিজস্ব বহু প্রলক্ষণ লোপ পেয়ে যায়। প্রলক্ষণসমূহের এই প্রকার হস্তান্তরের ফলে কোন সংস্কৃতির চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়াকে সহজাত সাংস্কৃতিকরণ (acculturation) বলে। যদি দুটি সংযোগী সংস্কৃতি অসম শক্তি ও মানের হয়, তবে শক্তিশালী সংস্কৃতি দুর্বল সংস্কৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। দুর্বল সংস্কৃতির মধ্যে সামান্য অথবা ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ঐ সংস্কৃতিতে সহজাত সাংস্কৃতিকরণ ঘটেছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল সংস্কৃতি তার নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে প্রভাবকারী শক্তিশালী সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, এবং দুর্বল সংস্কৃতির এই পরিণামকে আত্তীকরণ (assimilation) বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সহজাত সাংস্কৃতিকরণের দৃষ্টান্তই বেশী পাওয়া যায়। যে সংস্কৃতি অধিক শক্তিশালী ও প্রভাবকারী, তাকে "দাতা সংস্কৃতি" (donor culture) বলে এবং যে সংস্কৃতি প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়, তাকে

www.pathagar.com

"গ্রহীতা সংস্কৃতি (recipient culture) বলে। অবশ্য সহজাত সাংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র একপাক্ষিক ঘটনা নয়। শক্তিশালী সংস্কৃতি অধিক প্রভাবশালী হলেও ঐ সংস্কৃতি দুর্বল সংস্কৃতি থেকে কিছু কিছু প্রলক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। স্প্যানীশগণ ল্যাটিন আমেরিকায় আগমনের পর তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি (ইউরোপীয়) সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রতিস্থাপিত করে; অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নগরীয় তথা জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তর রূপান্তরিত হয় এবং সহজাত সাংস্কৃতিকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু ঐ একই সময়ে ল্যাটিন আমেরিকায় স্প্যানীশ সংস্কৃতিও কিছুটা রূপান্তরিত হয়। স্থানীয় আদিবাসীদের (রেড ইণ্ডিয়ান) সাথে যোগাযোগের ফলে স্প্যানীশ গৃহ নির্মাণ, পোশাক, ভাষা ইত্যাদিতে আদিবাসীদের প্রভাব দেখা যায়। এমন কি আদিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত পশু ও উৎপাদিত শস্য স্প্যানীশরা গ্রহণ করে নেয়। আদিবাসিগণ "গ্রহীতা সংস্কৃতি" হওয়া সত্ত্বেও স্প্যানীশ "দাতা সংস্কৃতি"কে প্রভাবিত করেছে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রহীতা সংস্কৃতি সকল সময় দাতা সংস্কৃতির প্রলক্ষণ অপরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রহীতা সংস্কৃতি দাতা সংস্কৃতির অবদান, তার স্বকীয় আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার ও প্রয়োজনে পরিবর্তিত করার পর গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য না হ'লে প্রত্যাখ্যানও করে থাকে। সুতরাং, সহজাত সাংস্কৃতিকরণের মাত্রা ও পরিমাণ মূলতঃ দুটি সংযোগকারী সংস্কৃতির গুণগত ও পরিমাণগত সাংস্কৃতিক সম্ভারের উপর নির্ভর করে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃতির রূপান্তর

সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার পরিবর্তনশীলতা। প্রত্যেক সংস্কৃতি অবিরত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের হার বা দ্রুততা নির্দিষ্ট করা যায় না, বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলে বিভিন্ন হারে সংস্কৃতি রূপান্তরিত হয় এবং এই রূপান্তরের মাধ্যমে সংস্কৃতির নিজস্ব পুষ্টি সাধন হয়। কোন কোন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর অতি দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়েছে, আবার অনেক সংস্কৃতি বহু শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি স্থিতিশীল ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। অবশ্য সাধারণতঃ সকল সংস্কৃতি গতিশীল (dynamic)। নতুন প্রলক্ষণ, আচার, প্রথা ইত্যাদির উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের দ্বারা সংস্কৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নবপ্রবর্তনের ধারার সাথে সাথে পুরাতন বহু প্রলক্ষণ সংশোধিত হয় অথবা লোপ পেয়ে যায়। উদ্ভাবন বা নবপ্রবর্তন কোন সংস্কৃতির অভ্যন্তরে ঘটতে পারে, কিংবা অন্য সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত প্রলক্ষণ কোন বাহকের মাধ্যমে সেখানে প্রবর্তিত হতে পারে। বহিরাগত প্রলক্ষণ ক্রমশ নতুন সমাজে গৃহীত হওয়ার পর গোটা সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, সংস্কৃতির রূপান্তর পর্যায়ক্রমে উদ্ভাবন, প্রসারণ, সামাজিক স্বীকৃতি, বাছাইকৃত পরিহার এবং পরিশেষে সমন্বয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

উদ্ভাবন (Invention)

উদ্ভাবন সংস্কৃতি রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়া। কোন নতুন প্রলক্ষণ, আচার, প্রথা বা চিন্তাধারার সৃষ্টিকে উদ্ভাবন বলে। এই উদ্ভাবন কোন সংস্কৃতির একজন সদস্য বা একটি গোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্টি হতে পারে। উদ্ভাবিত প্রলক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই প্রলক্ষণের পূর্ববর্তী কোন অস্তিত্ব থাকে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পূর্বাহ্নে বিদ্যমান কোন আচরণ বা প্রলক্ষণের ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের ফলে সম্পূর্ণ এক নতুন প্রলক্ষণ উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাতীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত সকল সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতিতে আবার এরূপ উদ্ভাবনের নমুনাও দেখা যায়

www.pathagar.com

যেখানে নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ যথার্থই নতুন এবং অতীতের কোন কিছুর সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। উদ্ভাবন সংস্কৃতির মধ্যে সৃজনশীলতার পরিচয় দেয় এবং সৃষ্টিধর্মী উদ্ভাবন একটি সংস্কৃতিকে উত্তরোত্তর পুষ্ট ও বিস্তৃত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ভাবন সকল সময় পরিকল্পিত উপায়ে সাধিত হয় না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গিয়েছে যে ঘটনাচক্রে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যতীত বহু প্রলক্ষণের উদ্ভাবন ঘটেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐ নতুন প্রলক্ষণ উপযোগী প্রমাণিত হ'লে তার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে। অপরদিকে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সুপরিকল্পিত উপায়ে বহু উদ্ভাবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে সারা পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এরূপ পরিকল্পিত উদ্ভাবন ঘটছে। উদ্ভাবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য দুটি সংস্কৃতিতে একই প্রলক্ষণের স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবন, অর্থাৎ একই প্রলক্ষণ দুটি ভিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কবিহীন সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত হতে পারে। অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকাংশ মানবগোষ্ঠীতে উদ্ভাবনের সংখ্যা কম, বাস্তবে অধিকাংশ সংস্কৃতি অপর কোন সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত প্রলক্ষণের প্রসারণের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যাপন (Diffusion)

যদি একই প্রলক্ষণের অস্তিত্ব একাধিক সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়, তখন দুটি বিকল্প সম্ভাবনা চিন্তা করা হয়। প্রথমতঃ ঐ প্রলক্ষণটি প্রত্যেক সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং দ্বিতীয় বিকল্প সম্ভাবনা হচ্ছে যে ঐ প্রলক্ষণ কোন একটি সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত হওয়ার পর অপর সকল সংস্কৃতিতে ব্যাপ্তিলাভের মাধ্যমে তা প্রবর্তিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে দেখা যায়। এক সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত প্রলক্ষণ, চিন্তাধারা ইত্যাদি অন্য সংস্কৃতিতে ব্যাপ্তিলাভ করাকে প্রসারণ বা ব্যাপন বলা হয়। ঐ অর্থে ব্যাপনকে সংস্কৃতি রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় বলা চলে। নৃতত্ত্ববিদগণ ব্যাপন প্রক্রিয়াকে অনেক সময় "সাংস্কৃতিক ঋণ" (cultural borrowing) নামেও অভিহিত করেছেন। প্রসারণ বা ব্যাপন যথার্থই একটি ভৌগোলিক ঘটনা, কারণ ব্যাপন বলতে আমরা একটি পারিসরিক প্রক্রিয়া (spatial process) বুঝি। সময়ের ব্যবধানে

www.pathagar.com

একটি প্রলক্ষণ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পাঁচটি প্রধান অবস্থা বা পরিবেশ ব্যাপনে সহায়তা করে থাকে। এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত যোগাযোগ (personal contact), ধর্মপ্রচারকের তৎপরতা (missionary activity), বাণিজ্য (trade), দেশজয় (conquest) এবং গণ-সংযোগ মাধ্যম (mass media)। ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিঃসন্দেহে অতি স্বল্প সময়ে নবপ্রবর্তিত ও উদ্ভাবিত প্রলক্ষণ ভিন্ন সংস্কৃতিতে পরিচিত করে এবং তার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। যে সংস্কৃতিসমূহ যত বেশী পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থাকে, তাদের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তত অধিক। এ কারণে দেখা যায় যে, নিকট প্রতিবেশী সংস্কৃতিতে দ্রুত ও অধিকতর ব্যাপন সংঘটিত হয়। পল্লীসমাজে কোন একটি গ্রামে প্রবর্তিত কোন বিশেষ কৃষিপদ্ধতি যোগাযোগের ফলে সর্বপ্রথম প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং পরে তা দূরবর্তী গ্রামসমূহে বিস্তার লাভ করে

ধর্মপ্রচারকগণ প্রায়ই নিজস্ব সংস্কৃতির প্রলক্ষণ তাদের প্রচারকার্যের এলাকায় প্রবর্তন করেন এবং অতীতে ধর্মপ্রচারকগণ ব্যাপনের অন্যতম, প্রধান শক্তিরূপে বিবেচিত হতেন। ধর্ম ব্যতীত যাবতীয় ধর্মীয় আচার ও প্রথা ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমেই ভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রবর্তিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, দেশজয়ের ফলে বিজয়ী সংস্কৃতি বিজিত বা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির উপর নিজস্ব সংস্কৃতি বলপূর্বক চাপিয়ে দেয় এবং ফলে বিজিত সংস্কৃতিতে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রলক্ষণসমূহ ব্যাপ্তিলাভের সুযোগ পায়। আধুনিক কালে, 'বাণিজ্য' সাংস্কৃতিক প্রসারণের অন্যতম প্রধান বাহনরূপে ভূমিকা পালন করছে। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আজকাল দূরতম সমাজে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত প্রলক্ষণ অতি সহজে ভিন্ন সংস্কৃতিতে উপস্থাপিত ও প্রবর্তিত হচ্ছে। এর সাথে সাথে গণ-সংযোগ মাধ্যম (সংবাদ-পত্র সাময়িকী, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা) পৃথিবীর প্রায় সকল সংস্কৃতিকে একে অন্যের অতি নিকটে এনে দিয়েছে। গণসংযোগ মাধ্যমের তৎপরতার ফলে এখন কোন সংস্কৃতি আর বিচ্ছিন্ন নয় এবং পৃথিবীর যে কোন সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত কোন প্রলক্ষণের তথ্য অতি অল্প সময়ে অপর সকল সংস্কৃতিতে

www.pathagar.com

পরিবেশিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। গণসংযোগ মাধ্যমের প্রচারকার্য তাই পৃথিবীব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রসারণে সহায়তা করেছে।

সুইডিশ ভূগোলবিদ হাগার স্ট্রাণ্ডকে (Hagerstrand) অনুসরণ করে ভূগোলবিদগণ প্রসারণ প্রক্রিয়ার সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। উদ্ভাবনের উৎপত্তিস্থল থেকে বিভিন্ন "সময়কালে" (time period) প্রসারণের চরিত্র বর্ণনা করে এক মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডেলে দেখানো হয়েছে যে, উদ্ভাবনের অব্যবহিত পর অর্থাৎ প্রথম সময়কালে উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসারণ সংঘটিত হয়; দ্বিতীয় সময়কালে

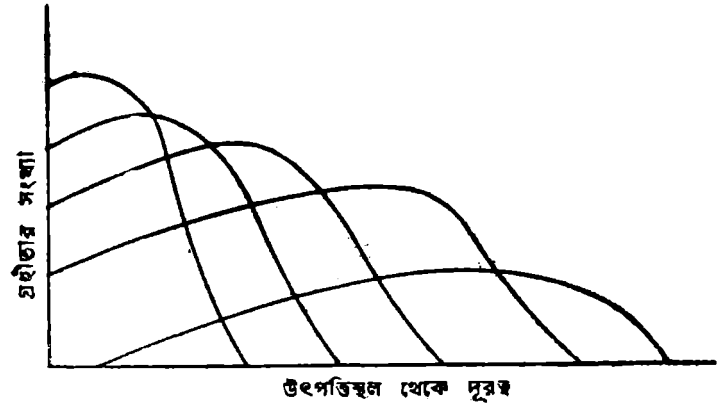

চিত্র—১ : প্রসারণ প্রবাহ

আরও অধিক দূরত্বে ব্যাপ্ত হয় এবং উৎপত্তিস্থলের সংলগ্ন অঞ্চলে প্রথম সময়কাল অপেক্ষা কম ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী সকল ধারাবাহিক সময়কালে এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপ্তি হতে থাকে এবং উৎপত্তিস্থলের নিকটে ব্যাপনের ভূমিকা ক্রমশ কমে আসে (চিত্র—১)। অনুরূপ আরেকটি

www.pathagar.com

মডেল দ্বারা প্রসারণ ধারার বর্ণনা দেওয়া যায়। এই ধারা S-আকৃতির এক বক্ররেখা দ্বারা চিত্রায়িত করা হয় (চিত্র—২)। ঐ মডেলের মূল কথা হচ্ছে যে, প্রথম সময়কালে যে কোন প্রলক্ষণের প্রসারণ অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সময়কালে প্রলক্ষণটি জনপ্রিয়তা লাভ করে ও প্রসারণ দ্রুততর হয়; এবং চতুর্থ সময়কালে (যখন প্রলক্ষণটি ইতিমধ্যে অধিকাংশ মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছে) প্রসারণ প্রক্রিয়া আবার মন্থর হয়ে যায়।

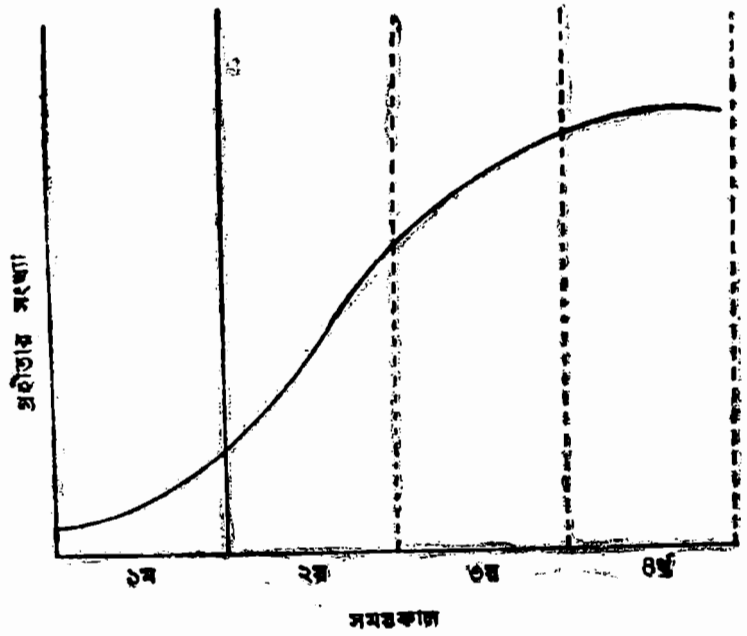

চিত্র - ২ঃ প্রসারণ ধারা

পারিসরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসারণ প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) সম্প্রসারণশীল প্রসারণ (Expansion Diffusion) এবং (খ) পুনঃস্থাপিত প্রসারণ (Relocation Diffusion)। কোন প্রলক্ষণের তথ্য যখন সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত ও পরিবেশিত হয়, তখন তার প্রসারণ কেবলমাত্র

www.pathagar.com

পরিবেশনের নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর তা ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং পরিশেষে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঐ প্রলক্ষণের বিস্তৃতি ঘটে। যেহেতু প্রতি সময়কালে উক্ত প্রলক্ষণের প্রসারণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেজন্য এ জাতীয় প্রসারণকে সম্প্রসারণশীল প্রসারণ বলে (চিত্র – ৩) কোন গ্রামে উন্নতমানে একটি নতুন শস্যবীজ সরবরাহ করা হলে তার প্রসারণ প্রথমে প্রতিবেশী গ্রামে এবং পরবর্তী পর্যায়ে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে দেখা যায়।

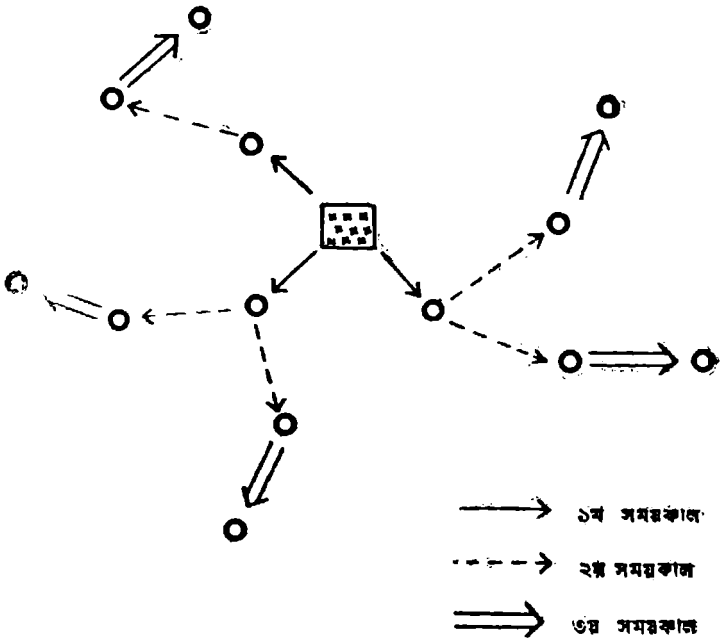

চিত্র – ৩ : সম্প্রসারণশীল প্রসারণ

প্রসারণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় দেখা যায় যে প্রবর্তনের প্রথম অঞ্চল থেকে একটি প্রলক্ষণ ধারাবাহিকভাবে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়নি, বরং উৎপত্তি-স্থলে তা বিলীন বা লুপ্ত হয়ে যায় এবং কোন বাহনের মাধ্যমে দূরবর্তী

www.pathagar.com

কোন অঞ্চলে পুনরায় প্রকাশ পায়। এ জাতীয় প্রসারণ পুনঃস্থাপিত প্রসারণ নামে পরিচিত (চিত্র—৪)। মানবগোষ্ঠীর প্রচরণের (migration) ফলে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আদি স্থলের সংস্কৃতি নতুন অঞ্চলে বা দেশে পুনঃস্থাপিত হতে দেখা গেছে।

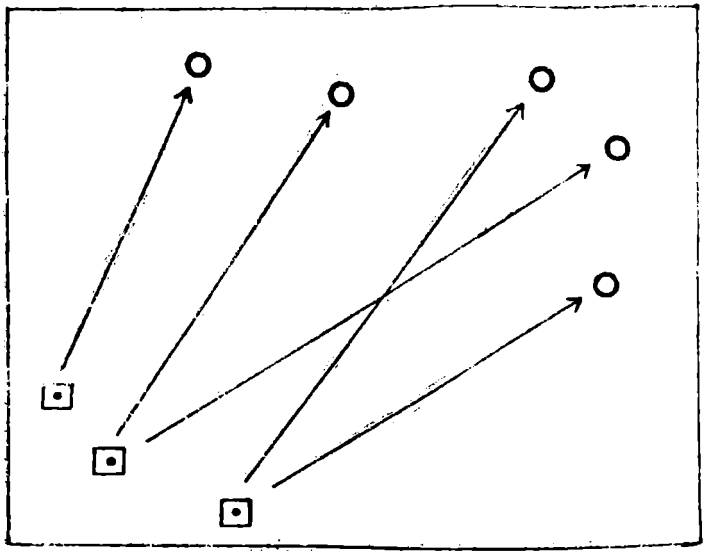

চিত্র—৪ : পুনঃস্থাপিত প্রসারণ

প্রসারণ প্রক্রিয়াকে আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) যে প্রসারণ প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তাকে সংক্রামক বা স্পর্শক প্রসারণ (contagious diffusion) বলে। স্পর্শ ও যোগাযোগের ফলে সংক্রামক ব্যাধি যেরূপে বিস্তার লাভ করে, সংক্রামক প্রসারণ অনুরূপভাবে ঘটে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে কোন নতুন ভাবধারা বা প্রলক্ষণ অথবা কোন সংক্রামক ব্যাধি প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমে প্রসারণ লাভ করে এবং তাকে সংক্রামক প্রসারণ বলা যায়। (খ) ভৌগোলিক দূরত্ব ও সংযোগের পরিবর্তে যদি সামাজিক দূরত্ব ও স্তর প্রসারণকে নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

করে তখন তাকে আনুক্রমিক প্রসারণ (hierarchical diffusion) বলে। (চিত্র—৫)। পোশাকের নবতম ফ্যাশন সাধারণতঃ সমাজের উচ্চবিত্ত ও নগরীয় সম্প্রদায়ে প্রসারণ লাভ করে এবং আনুক্রমিক ধারা অনুসরণ করে ঐ ফ্যাশন পরিশেষে সাধারণের নিকট ও পল্লীঅঞ্চলে প্রবর্তিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রসারণ প্রক্রিয়াকে উপরোক্ত যে কোন একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না ; কারণ বাস্তবে সম্প্রসারণশীল প্রসারণ ও পুনঃস্থাপিত প্রসারণ উভয়ই সংক্রামক বা আনুক্রমিক নমুনার হতে পারে। কিন্তু প্রসারণ নিঃসন্দেহে সংস্কৃতি রূপান্তরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে প্রত্যেক সংস্কৃতি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হয়।

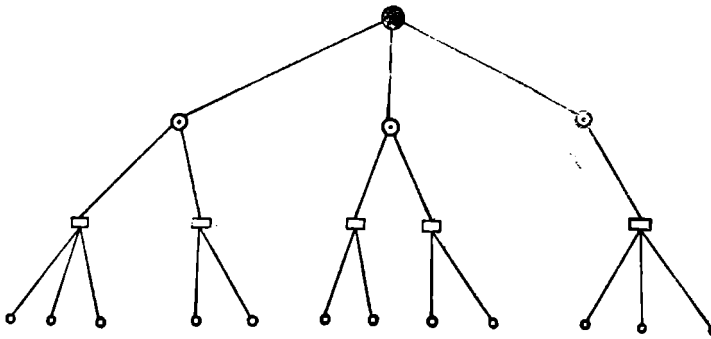

চিত্র—৫ : আনুক্রমিক প্রসারণ

সামাজিক স্বীকৃতি (Social Acceptance)

কোন প্রলক্ষণ বা আচরণের প্রসারণ যখন কেবলমাত্র উদ্ভাবক বা তার সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ঐ প্রলক্ষণ বা আচরণ শুধু ব্যক্তিগত আচরণ বা প্রকৃতিরূপে গণ্য হতে পারে তা তখনও গোটা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সংস্কৃতি রূপান্তরের জন্য প্রসারণের মাধ্যমে যে প্রলক্ষণ প্রবর্তিত হয়, তা সমাজের অধিকাংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত ও স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অতএব, 'সামাজিক স্বীকৃতি' সংস্কৃতি রূপান্তরের তৃতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া। সামাজিক স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে যে, কোন নবপ্রবর্তিত

www.pathagar.com

প্রলক্ষণ তার উদ্ভাবক ব্যতীত অপর সকলের কাছেও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে। প্রথমতঃ সমাজের কিছু সংখ্যক সদস্য দ্বারা একটি প্রলক্ষণ স্বীকৃতি লাভ করে এবং ক্রমশ তা সমাজের একটি উপগোষ্ঠির সংস্কৃতির অংশরূপে পরিগণিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে, সমাজের সকল অংশে আরও সম্প্রসারিত হ'লে ঐ প্রলক্ষণ গোটা সমাজের নিকট স্বীকৃতি পায় ও গৃহীত হয়।

কোন প্রলক্ষণের উদ্ভাবক ও কোন নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ প্রসারণের উদ্যোক্তার সামাজিক মান ও মর্যাদা ঐ প্রলক্ষণের সামাজিক স্বীকৃতি লাভে অনেকখানি প্রভাবিত করে। সম্মানিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক উপস্থাপিত বা প্রবর্তিত প্রলক্ষণ স্বভাবতই সাধারণের নিকট সহজে স্বীকৃতি পায়। পক্ষান্তরে স্বল্প পরিচিত বা সমাজের অপ্রিয় গোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত প্রলক্ষণের সামাজিক স্বীকৃতি লাভ পেতে সাধারণতঃ দেখা যায় না অথবা বিলম্বিত হয়।

বাছাইকৃত পরিহার (Selective elimination)

সংস্কৃতি রূপান্তরের চতুর্থ পর্যায় বাছাইকৃত পরিহার। বাছাইকৃত পরিহার বলতে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) নীতির ন্যায় যোগ্যতম প্রলক্ষণের উদ্‌বর্তন (survival) বুঝি। সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে এমন সকল নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ উদ্‌বর্তনের জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। যদি নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ বা আচরণ পূর্বাহ্নের বিকল্প প্রলক্ষণ বা আচরণ অপেক্ষা অধিক উপযোগী মনে হয়, তবে ঐ প্রলক্ষণ বা আচরণ টিকে থাকবে; কিন্তু যদি তা উপযোগী ও সন্তোষজনক হতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ঐ প্রলক্ষণ বা আচরণ লোপ পাবে। এখানে জীববিজ্ঞানের যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন (survival of the filtest) নীতির সাথে সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রত্যেক সমাজে নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ সমূহের উপযোগিতা মূল্যায়নের দ্বারা তাদের মধ্যে অকার্যকর প্রলক্ষণসমূহ বাছাই করে পরিহার করা হয়। এই মূল্যায়ন সাধারণতঃ পরখ ও ত্রুটি"র (trial and error) মাধ্যমে করা হয় এবং উপযোগী নয় এমন সকল প্রলক্ষণ সংস্কৃতি থেকে বাদ পড়ে যায়। যে সকল প্রলক্ষণ এই পরিহার প্রক্রিয়ায় টিকে থাকে, সেগুলো সংস্কৃতির রূপান্তরে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

সমন্বয়ন (Integration)

সংস্কৃতির রূপান্তরের সর্বশেষ পর্যায় সমন্বয়ন মূলতঃ প্রত্যেক সংস্কৃতি প্রলক্ষণ ও আচরণের একটি বিরাট ভাণ্ডার। ঐ সকল প্রলক্ষণ ও আচরণ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ এবং উদ্‌বর্তনের জন্য প্রতিযোগিতার সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে সমন্বিত হয়ে একটি একক সত্তা সৃষ্টি করে। কোন প্রলক্ষণ উদ্ভাবন, প্রসারণ, সামাজিক স্বীকৃতি, উপযোগিতা যাচাই ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় নিঃসন্দেহে পরিমার্জিত হয় এবং সংস্কৃতির অন্যান্য প্রলক্ষণ ও আচরণসমূহকে প্রভাবিত করে। তার ফলে সকল প্রলক্ষণের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (interation) ও তার পুঞ্জীভূত প্রভাব গোটা সংস্কৃতিতে এক সমন্বয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

নৃতত্ত্ববিদগণ পূর্বে মনে করতেন যে, কোন সংস্কৃতির সকল উপাদান এক নিখুঁত সমন্বিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু বাস্তবে কোন সংস্কৃতিতে নিখুঁত সমন্বিত অবস্থা বা ভারসাম্য (equilibrium) পাওয়া যায় না। কোন নবপ্রবর্তিতে প্রলক্ষণ গোটা সংস্কৃতিতে আত্তীভূত ও সমন্বিত হতে বেশ কিছু বছর সময় লাগে এবং ইতিমধ্যে ঐ সংস্কৃতিতে হয়ত অপর কোন প্রলক্ষণের প্রসারণ ঘটে যায় এবং পুনরায় সমন্বয়ন প্রক্রিয়া চালু হয়। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি সংস্কৃতিতে সমন্বয়ন প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে এবং আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হওয়াই ঐ সংস্কৃতির চূড়ান্ত অভীষ্ট লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, একটি নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণের সামাজিক স্বীকৃতি ও সংস্কৃতিতে তার পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ের মধ্যবর্তী সময়কালকে "সাংস্কৃতিক বিলম্ব" (cultural lag) বলে। এই "বিলম্ব" কালের মধ্যে নবপ্রবর্তিত প্রলক্ষণ ও পূর্ববর্তী প্রলক্ষণসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং একটি সুবিন্যস্ত সংস্কৃতি গঠনের প্রচেষ্টা চলে।

সংস্কৃতির রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া মানবসমাজকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। পরিবর্তন সকল সময়ই অস্বস্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও সংস্কৃতির নিজস্ব অস্তিত্বের তাগিদে পরিবর্তন ও রূপান্তর একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাই সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষ চরিত্র তার পরিবর্তনশীলতা।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-পরিবেশ ও মিথস্ক্রিয়া

প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করে এ প্রশ্ন অতি প্রাচীন। বহুকাল থেকে মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক আলোচিত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত প্রাধান্য পেয়েছে। অতি প্রাচীনকালে একথা সবাই সর্বসম্মতক্রমে স্বীকার করত যে, মানুষের সকল কাজ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা "নিয়ন্ত্রিত" হয়। আবার অনেকে কিছুটা নরম সুরে বলত যে, মানুষের কার্যাবলী পরিবেশ দ্বারা "প্রভাবিত" হয়। অপরদিকে এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের সাথে প্রকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক "অতি সামান্য"। প্রকৃতপক্ষে, ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের বিচার করলে দেখা যায় যে মানুষের সংস্কৃতি মানুষের কার্যাবলীর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা সেখানে গৌণ বা আনুষঙ্গিক। পরিবেশের ভূমিকা বা প্রভাব মূলতঃ মানুষের সংস্কৃতি দ্বারা নির্দেশিত হয় কারণ একই প্রাকৃতিক পরিবেশ একজন কৃষক, পশুপালক, ব্যবসায়ী, বা শিকারী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে। অতএব, প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বপ্রধান নির্দেশক হতে পারে না। পরিবেশ একটি সক্রিয় শক্তি এবং মানুষ তার নিষ্ক্রিয় অনুসারী– এই মতবাদ আধুনিক ভৌগোলিক চিন্তাধারায় স্বীকৃতি পায় না। পক্ষান্তরে, মানুষকে প্রধান সক্রিয় শক্তি ও পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। মানুষ তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ও বিশ্লেষণ করে এবং নিজ প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করে। পরিবেশ কদাচিত মানুষকে সরাসরি প্রভাবিত করে, বরং অনুরূপ পরিবেশের প্রতি বিভিন্ন মানবসমাজ বা সংস্কৃতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়ান্বিত হয়। মানব পরিবেশ সম্পর্কের বিস্তৃত উপলব্ধির জন্য প্রথমে দুটো পরস্পরবিরোধী মতবাদ—পরিবেশবাদ ও সম্ভাবনা-বাদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

পরিবেশবাদ (Environmentalism)

মানুষের সকল কর্মতৎপরতা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়—এই চিন্তাধারা ভূগোলে পরিবেশবাদ নামে পরিচিত। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকার জন্য এই মতবাদকে পারিবেশিক নিমিত্তবাদ বা Environmental Determinism নামেও অভিহিত করা হয়। পরিবেশবাদ প্রথম সুস্পষ্ট উপস্থাপনা করেন হিপক্রেটিস (Hippocrates) তাঁর Airs, Waters, Places গ্রন্থে (৩২০ খ্রীঃ পূঃ)। হিপক্রেটিস মূলতঃ একজন গ্রীক চিকিৎসক ছিলেন এবং বিদেশগামী সহকর্মী চিকিৎসকদের সুবিধার্থে তিনি ঐ বই পথপঞ্জিরূপে লিখেছিলেন। হিপক্রেটিস পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি দাবী করেন যে, ইউরোপের বৈচিত্র্যপূর্ণ জলবায়ুর জন্য সেখানকার মানুষের শারীরিক গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ অসামাজিক, কিন্তু কর্মঠ। অপরদিকে বৈচিত্র্যবিহীন এশিয়ার জলবায়ু হেতু (হিপক্রেটিস-এর মতে) সেখানকার জনসাধারণ সামরিক শক্তিতে দুর্বল।

বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল্-এর (Aristotle) লেখাতেও পরিবেশ-বাদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, উত্তরে অবস্থিত শীতপ্রধান ইউরোপবাসীর কর্মশক্তি প্রচুর, কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার অভাব; সুতরাং, তারা স্বাধীন হলেও রাজনৈতিক সংগঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তাদের কোন যোগ্যতা নেই। অন্যদিকে দক্ষিণের গ্রীষ্মপ্রধান এশিয়াবাসী বুদ্ধিমান ও দক্ষ, কিন্তু তাদের কর্মশক্তির যথেষ্ট অভাব; তার ফলে তারা পরাধীন ও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু উপরোক্ত দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় বসবাসকারী গ্রীকগণ উভয় অঞ্চলের উত্তম গুণাবলীর অধিকারী এবং সেজন্য তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।

প্রাচীন ভূগোলবিদ স্ট্র্যাবো-র (Strabo) লিখিত গ্রন্থাদিতেও একই ধরনের পরিবেশবাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি রোমের উত্থান ও গৌরব ইটালীর আকৃতি, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ জাতীয় পরিবেশবাদী বিশ্লেষণের নজীর প্রাচীন যুগের বহু লেখকের লেখায় দেখা যায়।

www.pathagar.com

রেনেসাঁর যুগে পরিবেশবাদ পুনরায় একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মতবাদ রূপে আবির্ভূত হয় এবং ফরাসী দার্শনিক জঁা বোদাঁ (Jean Bodin, ১৫৩০–১৫৯৬ খ্রীঃ) এর অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তিনি মানবজাতির চরিত্রে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা পৃথিবীর তিনটি জলবায়ু অঞ্চলের প্রভাব বলে দাবী করেন। তাঁর মতে উত্তরাঞ্চলের শীতপ্রধান এলাকার মানুষ কর্মঠ, কিন্তু বুদ্ধিমান নয়, এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুসারী। অপর-দিকে দক্ষিণের উষ্ণাঞ্চলের জনসাধারণ অলস, কিন্তু বুদ্ধিমান এবং পরাধীন-ভাবে বসবাস করতে সন্তুষ্ট। কিন্তু মধ্যবর্তী সমভাবাপন্ন অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ ও বুদ্ধিমান এবং তারা প্রকৃত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। বোদাঁর মতামতে আরিস্টটলের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে, গ্রীসের স্থলে বোদাঁ তাঁর নিজ দেশ ফ্রান্সকে সর্বোত্তম পরিবেশের অধিকারী বলে দাবী করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মন্তেস্কুয়ার (Montesguieu) লেখাতেও অনুরূপ পারিবেশিক ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জলবায়ুকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি মনে করেন। তাঁর মতে শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ সাহসী, শক্তিশালী ও স্পষ্টবাদী, এবং দক্ষিণের উষ্ণাঞ্চলের মানুষ ভীরু, পরিশ্রমবিমুখ ও নির্জীব।

প্রায় এক শতাব্দী পর ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরী বাক্‌ল্‌ (Henry Buckle) তার History of Civilization গ্রন্থে পরিবেশবাদ প্রচার করেন। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে প্রধানতঃ জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মানব-ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান পরিবেশবাদী আমেরিকান ভূগোলবিদ মিস. এলেন. সেম্পল (Miss Ellen Semple)। তিনি জার্মান ভূগোলবিদ র‍্যাটসেলের ছাত্রী ছিলেন এবং র‍্যাটসেলের 'Anthropogeographic' গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে Influences of Geographic Environment গ্রন্থ ১৯১১ সালে প্রকাশ করেন। র‍্যাটসেলের প্রথম জীবনের পরিবেশবাদী মতামত (যা পরবর্তীকালে তিনি নিজেই পরিহার করেছেন) সেম্প্‌লের লেখায় আরও জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়। সেম্পল্‌ লিখেছেন

www.pathagar.com

যে, মানুষ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তার দেহ, মন ও অস্থিমজ্জার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

উপরে উল্লিখিত পণ্ডিতদের অধিকাংশই ভূগোলবিদ নন। কিন্তু মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণের দায়িত্ব ভূগোলবিদের—এ ধারণা সার্বজনীন। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই "ভৌগোলিক" শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণের দায়িত্ব সাধারণতঃ ভূগোলবিদের উপর ন্যস্ত করা হয়। অধিকাংশ লেখক "প্রাকৃতিক" পরিবেশ ও "ভৌগোলিক" পরিবেশকে সমার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু ভৌগোলিক শব্দের প্রকৃত অর্থ কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা পারিসরিক দৃষ্টিকোণকে বুঝায়। 'ভৌগোলিক" শব্দের বহুল প্রচলিত এই ভুল প্রয়োগের জন্য ভূগোলশাস্ত্রে পরিবেশবাদ বহুকাল ধরে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদরূপে স্থান পেয়েছে এবং জনসাধারণের মনে ভূগোলশাস্ত্র পারিবেশিক প্রভাবসমূহের একটি শাস্ত্র রূপে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে মানুষের কর্মকাণ্ডের নিবিড় বিশ্লেষণের ফলে মানবসংস্কৃতির যে শক্তিশালী রূপ প্রকাশ পায়, তাতে আধুনিক ভূগোলশাস্ত্রে পরিবেশবাদের গুরুত্ব অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে। পরিবেশবাদিগণ প্রায়ই অপর্যাপ্ত ও পরস্পর বিরোধী তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ বা সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেগুলির নিরীক্ষা করলে তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে। পরিবেশবাদের অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে যে, এই মতাদর্শিগণ তাঁদের মতবাদ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন তথ্য সংকলন করেছেন, কিন্তু প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব একটি সাধারণ বিষয়বস্তু নয়, কারণ মানুষ প্রতিনিয়তই তার সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সুতরাং, পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে একটি সামগ্রিক মানব-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়ার (interaction) কাঠামোতে পরীক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

সম্ভাবনাবাদ (Possibilism)

সংস্কৃতির এবং মাধ্যমেই মানবজাতির প্রকাশ। তাই মানব-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়া বস্তুতপক্ষে সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝায়। প্রাচীন ভূগোলবিদগণ অনেকেই পরিবেশবাদের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভূগোলশাস্ত্রে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক উপাদান-সমূহ সর্বদা উপেক্ষিত হয়েছে। আধুনিক ভূগোলশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আলেকজাণ্ডার ফন্ হুমবোল্ট প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কাজ করেছেন, কিন্তু তার সাথে সাথে তিনি সে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক অপর বিখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ কার্ল রিটার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের উপর কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে অপর একজন জার্মান ভূগোলবিদ ফ্রিডরিক র‍্যাটসেল প্রথমতঃ পরিবেশবাদে আকৃষ্ট হন এবং পরে ঐ মতবাদের অসারতা উপলব্ধি করেন। র‍্যাটসেল তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় মানুষের কর্মকাণ্ডে তার সংস্কৃতির অসাধারণ প্রভাবের কথা জোরালোভাবে প্রকাশ করেন। মানবসংস্কৃতির এই উচ্চতর ক্ষমতার সাধারণ অর্থ হচ্ছে যে, মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের আজ্ঞাবহ নয়, বরং সে প্রাকৃতিকরূপে সৃষ্ট পরিবেশকে নিজ পছন্দমত ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কাছে একাধিক ও বিভিন্ন সম্ভাবনা ও সুবিধাদি উপস্থাপন করে এবং মানুষ তার সংস্কৃতির মাধ্যমে বিচার করে যে কোন একটি বা একাধিক সম্ভাবনা বেছে নেয়। ফ্রান্সের পল ফেভ্র (Paul Febvre) এই চিন্তাধারার তাই নামকরণ করেছেন "সম্ভাবনাবাদ" (possibilism) প্রকৃতি কর্তৃক বিভিন্ন সম্ভাবনা উপস্থাপন এবং মানুষ কর্তৃক স্বেচ্ছায় কোন সম্ভাবনা মনোনয়ন করাকে সম্ভাবনাবাদ বলে। এখানে মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা গৌণ বা নিষ্ক্রিয় বলে মনে করা হয়েছে। সম্ভাবনাবাদে পরিবেশের বৃহত্তর সীমিতকারী পরিধিকে অস্বীকার করা হয়নি, তবে মানুষের সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্ব না দিয়ে তার কর্মকাণ্ডের প্রশস্ততার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

পল ফেভ্‌র্‌ তাঁর Geographical Introduction to History গ্রন্থে সম্ভাবনাবাদের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, যুগ যুগ ধরে তার সীমাহীন তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের চরিত্র পরিবর্তন সাধনে মানুষ সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সম্ভাবনা-বাদের সার্বজনীন প্রচার ও জনপ্রিয়তা ফরাসী ভূগোলবিদ পল ভিদাল দা লা ব্লাশের (Poul Vidal de la Blache) অবদান অপরিসীম। তিনি তাঁর লেখায় পারিবেশিক নিমিত্তবাদের ঘোরতর বিরোধিতা করেন এবং তাঁকে সাধারণতঃ পরিবেশবাদের বিপরীতধর্মী মতবাদ সম্ভাবনা-বাদের জনকরূপে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মতে ভূপৃষ্ঠ মানুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ড নির্দেশ করে না—ভূপৃষ্ঠ কেবলমাত্র সুযোগ-সুবিধাদি উপস্থাপন করে এবং মানবসমাজ তার মধ্য থেকে বাছাই বা মনোনয়ন করে। মানুষের এই "মনোনয়ন" কোন বিচ্ছিন্ন বা খামখেয়ালী প্রক্রিয়া নয়। একটি মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানসিক কাঠামো, ঐতিহ্য, প্রাযুক্তিক মান তথা তার সংস্কৃতি দ্বারা এই মনোনয়ন প্রভাবিত হয়। ভিদাল মানুষের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে তার জীবনধারার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর মতবাদ Principles of Human Geography (১৯২১ খ্রীঃ) গ্রন্থে সুসংহতভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেননি, তবে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডই প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন ধারণার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। মানুষ তার প্রকৃতি ও স্বভাবের দৃষ্টি দিয়ে তার পরিপার্শ্বের আবাস ভূমিকে অবলোকন করে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এই অবলোকন-প্রসূত উপলব্ধি ভিন্নতর হবে। ভিদালের এসকল ধারণা ও মতবাদ তাঁর উত্তরসূরিদের চর্চার ফলে আরও সূক্ষ্ম ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব অবদানের সব-চাইতে বড় দিক হ'ল যে তিনি মানবগোষ্ঠী ও তাদের জীবনধারাকে (genre de vie or way of life) ভৌগোলিক পঠনপাঠনের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী কত বিচিত্র উপায়ে যে ব্যবহার করেছে, তার সমীক্ষা নিলেই ভিদালের যুক্তিসমূহের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

www.pathagar.com

সম্ভাবনাদের আরেকজন ফরাসী সমর্থক হচ্ছেন, জঁ্য ব্রুনে (Jean Brunnes)। তাঁর লেখায় মানব-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণে মানবকর্ম তথা মানবসংস্কৃতির প্রভাবশালী শক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। মানুষকে একটি সজীব ও সক্রিয় শক্তিরূপে বিবেচনা করে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনে তার সামর্থের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দু'জন ভূগোলবিদের প্রচেষ্টায় সম্ভাবনাবাদ প্রচলিত পরিবেশবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছে. তাঁরা হলেন ইসায়াহ্ বোম্যান (Isaiah Bowman) এবং কার্ল সাওয়ার (Cari Sauer)। আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপে আমেরিকা থেকে আনীত আলু ও ভুট্টা চাষের সূচনা হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বোম্যান প্রশ্ন করেন যে, কৃষিক্ষেত্রের এই পরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা কি? তাঁর মতে এখানে পরিবেশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং মানবসংস্কৃতির ফলস্বরূপ একস্থানের শস্য অপর স্থানে চাষ করা সম্ভব হ'ল। কার্ল সাওয়ার তাঁর Morphology of Landscape (১৯২৫ খ্রীঃ) গ্রন্থে স্পষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে সম্ভাবনাবাদ উপস্থাপন করেন। তিনি ভূপৃষ্ঠে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে যে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বা মানবিক ভূদৃশ্য রচিত হয়েছে, তার বিশেষ গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং ঐ সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য গঠনে মানুষের মনোনয়ন শক্তির প্রাধান্য ব্যাখ্যা করেন।

এই শতাব্দীর বহু ভূগোলবিদের লেখায় সম্ভাবনাবাদ বেশ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এসকল লেখার মূল বক্তব্য এক—অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে কোন একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করে না, প্রকৃতি মানুষের সম্মুখে বিভিন্ন সুবিধাদি উপস্থাপন করে, এবং মানুষ স্বেচ্ছায় তার মধ্য থেকে মনোনয়ন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন বাধ্যতা নেই, আছে শুধু সম্ভাবনা এবং মানুষ ঐ সকল সম্ভাবনার নিয়ন্ত্রণকারীরূপে তার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং, মানুষ হচ্ছে মুখ্য শক্তি এবং প্রকৃতি কেবলমাত্র উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে।

সম্ভাবনাবাদ যে সকল সম্ভাবনা ও সুবিধাদির উপর জোর দেয়, সেসকল সম্ভাবনা অবশ্য সীমাহীন নয়। সম্ভাবনাবাদিগণ কখনো দাবী করেননি যে মানুষ সকল পারিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। এমনকি সম্ভাবনাবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক ফেভ্র্ পর্যন্ত বলেছেন যে মানুষ

www.pathagar.com

কখনই তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশমুক্ত করতে সক্ষম হয় না। পরিবেশের একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে মানুষ তার সাংস্কৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্ভাবনা থেকে প্রয়োজনমত বাছাই করে নেয়। সম্ভাবনাবাদের মূল বক্তব্য হ'ল যে মানুষের এই মনোনয়নশক্তি তার সংস্কৃতির ফল—সেখানে পরিবেশের কোন বাধ্যতা নেই। সম্ভাবনাবাদের সমালোচকগণ সম্ভাবনাবাদ পরিবেশকে সর্বস্বীভাবে উপেক্ষা করেছে বলে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই প্রত্যুত্তরে সম্ভাবনাবাদে পরিবেশের পরোক্ষ ভূমিকা যে ন্যায্য স্বীকৃতি পেয়েছে, তা সম্ভাবনাবাদিগণ বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পরিবেশবাদে মানুষকে পরিবেশের আজ্ঞাবহরূপে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু সম্ভাবনাবাদে পরিবেশিক প্রভাবের ক্ষমতাকে স্বীকার করে মানুষের মনোনয়ন-শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সবশেষে, পরিবেশবাদ ও সম্ভাবনাবাদ—এই দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারাকে সমন্বয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। মানুষ ও প্রকৃতিকে প্রাচীন পন্থীদের মত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয়ত সমীচীন নয় কারণ তাতে পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পায়। বিজ্ঞানের আদর্শ হওয়া উচিত সমন্বয় বা সঙ্গতি। সুতরাং, আধুনিক ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ শক্র বিবেচনা না করে মানব-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়াই সম্ভাবনাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মানবজাতির ক্রমবিকাশ

ভূপৃষ্ঠে প্রাণীকুলের ক্রমবিকাশ একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীর প্রায় পাঁচশত কোটি বছরের সময়সীমায় লক্ষাধিক প্রাণীজাতি ও প্রজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেরই বিলোপ ঘটেছে, আবার বহু প্রাণীকুল বিভিন্নতররূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মানবজাতি বা হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌ (Homo Sapiens) অন্যতম প্রাণী যার বিবর্তনকাল ও ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র। গত দুই দশকে জীবাশ্মবিজ্ঞানে নতুন পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে মানবজাতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রণয়নে অনেক সুবিধা হয়েছে। পূর্বে জীবাশ্মের ভূতাত্ত্বিক স্তর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা হ'ত। এই পদ্ধতি এখনো অনেকক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এর ফলাফল সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা যায়। তাই বর্তমানে পারমাণবিক তারিখ নির্ণয় পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। বিভিন্ন বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট হারে পারমাণবিক অবক্ষয় ঘটে থাকে এবং অবক্ষয় হার গণনার মাধ্যমে কোন জীবাশ্মের আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবজাতি এবং মানুষের পূর্বপুরুষ হতে পারে এমন বহু "মানব-সম" প্রাণীর জীবাশ্ম এবং তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার বা (tools) পাওয়া গিয়েছে। এসকল সম্পদের পারমাণবিক তারিখ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মানবজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের একটি মোটামুটি ধারাবাহিক চিত্রের রূপ দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া গেলেও ঠিক কোন্ যুগে মানব-সম বা "হোমিনিড" (hominid) প্রাণী এবং বনমানুষ (apes ; গরিলা, ওরাং উটাং, শিম্পাঞ্জী ও গিবন) পৃথক হয়ে নিজ নিজ ধারায় বিবর্তিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনো কিছু মতানৈক্য আছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সবাই একমত যে মানবজাতির বিবর্তন ধারায় সাধারণ বানরকুল বহু পূর্বেই (আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি বছর আগে) পৃথকীকৃত হয়েছে, এবং খুব সম্ভবত ১.৪ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির পূর্বপুরুষ এবং গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর পূর্বপুরুষের বিবর্তন একই ধারায় অগ্রসর

www.pathagar.com

হচ্ছিল। এই মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে মানব সম বা হোমিনিডের প্রথম প্রতিনিধি রামাপিথিকাস (Ramapithecus)। এই গোষ্ঠীর জিবাশ্মের অংশবিশেষ ভারত (১৯৩০ এর দশকে) এবং কেনিয়াতে (১৯৬১ খ্রীঃ) আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ঐ সকল জীবাশ্মের বয়স প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বছর। অনেকের মতে রামাপিথিকাস মানবজাতির সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ এবং আনুমানিক ১.৪ কোটি বছর পূর্বে রামাপিথিকাসের উৎপত্তির ফলে মানবজাতির পূর্বপুরুষ ঐ সময়কাল থেকে শিম্পাঞ্জী-গরিলার পূর্বপুরুষের ধারা থেকে বিভক্ত হয়ে স্বকীয় ধারায় অভিব্যক্ত হতে থাকে।

রামাপিথিকাসের কেবলমাত্র উপর ও নীচের চোয়াল এবং বেশ কিছু দাঁতের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু মাথার খুলি বা কোন দৈহিক অস্থি পাওয়া যায়নি। দাঁত ও চোয়ালের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয় যে রামাপিথিকাস বস্তুতই মানব-সম বা হোমিনিড ছিল এবং শিম্পাঞ্জী বা গরিলা অপেক্ষা আধুনিক মানুষের প্রকৃতির সাথেই তার অধিকতর মিল দেখা যায়। রামাপিথিকাস সম্ভবত অরণ্যাঞ্চলে বসবাস করত। তার দাঁত ও চোয়ালের গঠনে প্রকাশ পায় যে সে সম্ভবত বীজ ও শক্ত আঁটি খেতে অভ্যস্ত ছিল এবং আধুনিক বনমানুষের (apes) তুলনায় রামাপিথিকাসের ছেদক দাঁত (canine tooth) অত্যন্ত ছোট ছিল। রামাপিথিকাস দৈহিক আকৃতিতেও ছোট এবং তার ওজন প্রায় ৫০ পাউণ্ড বলে অনুমান করা হয়। রামাপিথিক্যাসের করোটির ধারণ-ক্ষমতা (cranial capacity) সম্ভবত ৪০ ঘন সেন্টিমিটারের কম ছিল। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ পর্যন্ত রামাপিথিকাসের যে সকল প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিতান্তই অপ্রতুল এবং মানবজাতির এই প্রথম পূর্বপুরুষের বিস্তারিত চরিত্র তাই সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করা সহজ নয়। এ কারণে কোন কোন জীবাশ্মবিদ রামাপিথিকাসকে মানব-সম বা হোমিনিড শ্রেণীভুক্ত করতে বেশী উৎসাহী নন।

অস্ট্রালোপিথিকাস (Australopithecus)

রামাপিথিকাস সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম মানব-সম জীব বা হোমিনিড রূপে স্বীকৃতি না পেলেও তার পরবর্তী প্রায় এক কোটি বছর সময়কালের কোন জীবাশ্মে মানবের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। যে জীবাশ্ম-মানবকে

www.pathagar.com

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও জীবাশ্মবিদ নিঃসন্দেহে মানব-সম বা হোমিনিডরূপে আখ্যায়িত করেছেন, তার নাম হচ্ছে অস্ট্রালোপিথিকাস (চিত্র—৬)। কেনিয়াতে আবিষ্কৃত অস্ট্রালোপিথিকাসের সর্বপ্রাচীন নিদর্শনের বয়স ৫০ লক্ষ বছর। তবে সাধারণতঃ অনুমান করা হয় যে, অস্ট্রালোপিথিকাস সম্ভবত ৫০ থেকে ১০ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত বসবাস করত। অস্ট্রালোপিথিকাস গোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত ঃ অস্ট্রালোপিথিকাস রোবাস্টাস (Australopithecus robustus) এবং অস্ট্রালোপিথিকাস আফ্রিকানাস (Australopithecus africanus)। এই দুই জাতীয় অস্ট্রালোপিথিকাসের তারতম্যের তাৎপর্য সম্পর্কে সবাই একমত নন, তবে উভয় গোত্রের জীবাশ্ম-মানব সাধারণ মানুষের ন্যায় সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো এবং বিছু স্থূল বা অমার্জিত হাতিয়ার (tools) তৈরী করতে জানত। প্রকৃতপক্ষে, অস্ট্রালোপিথিকাসকে প্রথম হাতিয়ার প্রস্তুতকারক রূপে অভিহিত করা হয়।

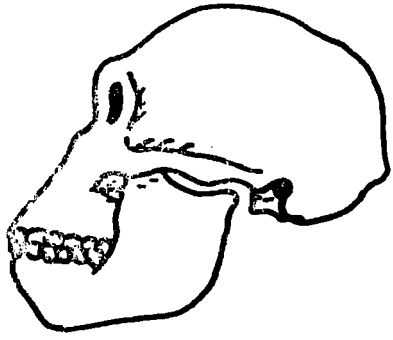

চিত্র—৬ : অস্ট্রালোপিথিকাসের করোটি

অস্ট্রালোপিথিকাস আফ্রিকানাস ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে একই দেশে অস্ট্রালোপিথিকাস রোবাস্টাসের প্রথম জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এই দুই গোত্রের মধ্যে অঃ আফ্রিকানাস অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়। শারীরিক গঠনে অঃ রোবাস্টাস অঃ আফ্রিকানাস অপেক্ষা বড়। কিন্তু উভয়ের পা, পায়ের পাতা, নিতম্ব অস্থি ও মেরুদণ্ডের আকৃতি অনুরূপ। উভয় গোত্রের

www.pathagar.com

অস্ট্রালোপিথিকাসের শারীরিক কাঠামো আধুনিক মানুষের ন্যায় দু'পায়ে সোজা হয়ে হাঁটার সাক্ষ্য দেয়। অস্ট্রালোপিথিকাসদ্বয়ের হাত, বাহু, ও স্কন্ধ আধুনিক মানুষের মত না হ'লেও তার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। অঃ রোবাস্টাসের ওজন ৮০ থেকে ১৪০ পাউণ্ড ছিল বলে অনুমান করা হয়; অন্যদিকে অঃ আফ্রিকানাসের ওজন ছিল ৪০ থেকে ৭০ পাউণ্ড। মূলতঃ এ দুই জাতীয় অস্ট্রালোপিথিকাসের মধ্যে পার্থক্য ঘাড়ের উপর অংশে সীমাবদ্ধ। অঃ আফ্রিকানাসের মুখমণ্ডল বিশেষ করে দাঁত ও চোয়াল—বেশ কিছুটা সম্মুখভাগে প্রক্ষিপ্ত এবং কপাল বেশ খানিকটা গোলাকার কিন্তু অঃ রোবাস্টাসের চোয়াল ততখানি সামনের দিকে প্রক্ষিপ্ত নয় এবং তার কপালের অংশটিও তেমন গোলাকার নয়। উভয় জাতীয় অস্ট্রালোপিথিকাসের মাথার খুলি বা করোটি বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে যে অঃ আফ্রিকানাসের করোটির ধারণক্ষমতা ছিল আনুমানিক ৪৪০ ঘন সেন্টিমিটার এবং অঃ রোবাস্টাসের ছিল ৫৫০ ঘন সেন্টিমিটার। করোটির ধারণক্ষমতার এই তারতম্য তাদের মানসিক শক্তির তারতম্য প্রতিফলিত করে না, বরং এই প্রভেদ দুই গোত্রের শারীরিক গঠনের বিভিন্নতার ফল। অস্ট্রালোপিথিকাসদ্বয়ের দাঁতের গঠনেও পার্থক্য দেখা যায়। অঃ রোবাস্টাসের ছেদক দাঁত (canine) ও কর্তক দাঁত (incisor) অঃ আফ্রিকানাসের দাঁত অপেক্ষা ছোট। অবশ্য উভয় গোত্রের অস্ট্রালোপিথিকাসের দাঁত আধুনিক শিম্পাঞ্জী অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। অস্ট্রালোপিথিকাসের দাঁত ও চোয়ালের বিশ্লেষণ দ্বারা জীবাশ্মবিজ্ঞানী ও প্রাচীন নৃতত্ত্ববিদগণ (paleoanthropologists) ঐ আদি মানব-সম প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অনুমান করার চেষ্টা করেছেন। অঃ রোবাস্টাস খুব সম্ভবত উদ্ভিদভোজী ছিল এবং অঃ আফ্রিকানাস ছিল সর্বভোজী। অবশ্য এ বিষয়ে সকল বিজ্ঞানী একমত হতে পারেননি।

কোন কোন প্রাচীন নৃতত্ত্ববিদ অস্ট্রালোপিথিকাসগোষ্ঠিকে আরও দুই ভাগে বিভক্ত করেন: হোমো হাবিলিস (Homo habilis) এবং জিন্‌জান্‌থ্রোপাস বইসেই (Zinjanthropus boisei)। শেষোক্ত গোত্রটি বর্তমানে অস্ট্রালোপিথিকাস বইসেই (Australopithecus boisei) নামে অধিকতর পরিচিত।) উভয় প্রকার অস্ট্রালোপিথিকাসের জীবাশ্ম বিশ্ববিখ্যাত

www.pathagar.com

প্রত্নতত্ত্ববিদ এল. এস বি. লীকি (L. S. B. Leakey) তানজানিয়ার ওল্‌ডুভাই গিরিখাতে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন, এবং তিনিই তাদের ঐ নামকরণ করেন। অঃ বইসেইকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের পর অঃ রোবাস্টাসের পরবর্তীকালের সংস্করণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু অঃ বইসেই কেবলমাত্র পূর্ব আফ্রিকাতেই পাওয়া গিয়েছে, তাই তাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত অঃ রোবাস্টাসের আঞ্চলিক উদাহরণ মনে করা হয়। বস্তুত-পক্ষে, অনেক বিজ্ঞানী অঃ বইসেই ও অঃ রোবাস্টাসকে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের জন্য একই গোত্রভুক্ত করে উভয়কে অঃ রোবাস্টাস নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। অবশ্য লীকি কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমো হাবিলিস অধিক কৌতূহলের সৃষ্টি করে, কারণ লীকির মতে এই আদি মানব-সম প্রাণীর করোটির ধারণক্ষমতা (৫০০ ঘন সেন্টিমিটার) অস্টালোপিথিকাসের ধারণ-ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী ছিল এবং সে আধুনিক মানবজাতির বৈশিষ্ট্য অধিকতর বহন করে। লীকি আরও মনে করেন যে, হোমো হাবিলিস নিঃসন্দেহে হাতিয়ার প্রস্তুত করতে সক্ষম ছিল এবং সেজন্য এই আদি মানব সম প্রাণীকে অনায়াসে "হোমো" তথা মানবজাতির পরিবারে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে সূচিত ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় অঃ আফ্রিকানাস, ক্রমশ পরবর্তীকালের হোমো ইরেক্টাস (Homo erectus) বা ঋজু মানবে বিবর্তিত হয়। এই বিবর্তন প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে চলেছে এবং হোমো হাবি-লিসকে সম্ভবত ঐ পরিবর্তনকালীন (transitional) সময়কালের আদি মানবের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে; অর্থাৎ হোমো হাবিলিস বা অঃ হাবিলিস একটি স্বতন্ত্র গোত্র নয়, বরং তারা অঃ আফ্রিকানাস ও হোমো ইরেক্টাসের মধ্যবর্তী কোন পর্যায়ের নিদর্শন। প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেক্টাস বা ঋজু মানব ক্রমশ অস্ট্রালোপিথিকাসের স্থান দখল করে নেয়।

হোমো ইরেক্টাস বা ঋজু মানব

মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অস্ট্রালোপিথিকাসের উত্তরসূরি হচ্ছে হোমো ইরেক্টাস বা ঋজু মানব। এই মানবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য তার ঋজুভঙ্গি। অনুমান করা হয় যে, ঋজু মানব সম্ভবত প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে বসবাস করত। বিজ্ঞানীর দুই গোত্রীয় ঋজু মানব চিহ্নিত করেছেন: জাভা মানব (Java Man) ও পিকিং মানব (Peking Man)। এদের মধ্যে জাভা মানব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

জাভা মানব : ইন্দোনেশীয়ার জাভা দ্বীপে সোলো নদীর তীরে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জাভা মানবের প্রথম জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। ডুবয়স্ (Dubois) নামের হল্যাণ্ডবাসী একজন ডাক্তার এই আবিষ্কার করেন। তিনি অশ্মীভূত কিছু দাঁত, মাথার খুলির অংশ এবং একটি জংঘাস্থি (thish bone) মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করেন এবং তিনি তাঁর আবিষ্কৃত প্রাণীকে পিথিক্যান্থ্রোপাস ইরেক্টাস (Pithecanthropus erectus) নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে তা জাভা মানব নামেই অধিক পরিচিত লাভ করে। ডুবয়সের আবিষ্কারের পর প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত জাভা মানবের আর কোন জীবাশ্ম পাওয়া

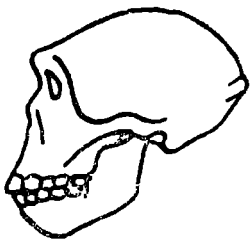

ক : জাভা মানবের করোটি

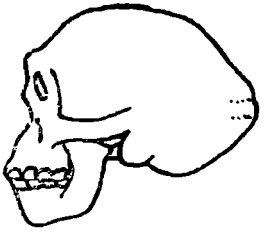

খ : পিকিং মানবের করোটি

চিত্র—৭

যায়নি। ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি ফন্ কোনিগ্স্ ওয়াল্ড্ (Von Koenigs Wald) এর উদ্যোগে পরিচালিত খননকাজের মাধ্যমে জাভা দ্বীপের ঐ একই স্থানে জাভা মানবের আরও অনেক জীবাশ্ম পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত এসকল সংকলনের ভিত্তিতে জাভা মানবের একটি সুস্পষ্টচিত্র রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

জাভা মানবের শারীরিক গঠনে অস্ট্রালোপিথিকাস হতে বেশ কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র—৭ক)। জাভা মানবের চোখের উপর

www.pathagar.com

ভ্রূঅস্থি বেশ সুস্পষ্ট ও উঁচু ছিল এবং ভ্রূঅস্থির উপর কোন পৃথক কপাল ছিল না। চোখের উপরিভাগ থেকে কপাল ঢালুভাবে অপসৃত হয়ে চ্যাপ্‌টা মাথার সাথে মিশে যেত। মাথার উপরের অংশ কিছুটা ত্রিকোণাকৃতি এবং মাথার পশ্চাদ্ভাগ বেশ চওড়া ছিল। তা ছাড়া ভারী ও শক্ত ঘাড় জাভা মানবের ঋজুভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। মুখের তালু অত্যন্ত বড় এবং দাঁতের কপাটি ও চোয়াল বেশ খানিকটা সম্মুখভাবে প্রক্ষিপ্ত। অবশ্য জাভা মানবের দাঁত নিঃসন্দেহে মানব-সম বা হোমিনিড। জাভা মানবের গোটা মাথার খুলি না পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা অন্যান্য তথ্য থেকে অনুমান করেন যে, এই জীবাশ্ম-মানবের করোটির ধারণক্ষমতা প্রায় ৭৭৫ থেকে ৯৭৫ ঘন সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছিল। এর ভিত্তিতে জাভা মানবকে অস্ট্রালোপিথিকাস অপেক্ষা উন্নত, কিন্তু আধুনিক মানব (যার করোটির গড় ধারণক্ষমতা ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার) অপেক্ষা বেশ প্রাচীন গণ্য করা হয়। জাভা মানব হয়তো উল্লেখযোগ্য কোন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিল না, কিন্তু আধুনিক মানবের সাথে তার বহু সাদৃশ্য থাকার জন্য তার নামে ডুবয়স্ প্রদত্ত "পিথিক্যানথ্রোপাস" শব্দটি বাদ দিয়ে সেখানে "হোমো" বা "মানব" শব্দটি যুক্ত করা হয়।

জাভা মানবের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জাভা মানবের অশ্মীভূত ধ্বংসাবশেষ যে সকল স্থানে পাওয়া গিয়েছে তার সাথে কোন অস্থি বা প্রস্তরের হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। তবে ঐ এলাকায় আবিষ্কৃত একপ্রকার কর্তন হাতিয়ার (chopper tool) দেখে মনে হয় যে জাভা মানব খুব সম্ভবত কোন প্রকার হাতিয়ার নির্মাণ করতে সক্ষম ছিল। জাভা মানব প্রধানতঃ উন্মুক্তস্থানে বাস করত এবং সে আগুনের ব্যবহার জানত না। এ ছাড়া, জাভা মানব দক্ষ শিকারী ছিল এমন কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত জাভা মানবকে প্রধানতঃ লুণ্ঠনজীবী (Predatory) আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

পিকিং মানব ঃ জাভা মানবের সাথে পিকিং মানবের সাদৃশ্যের জন্য এ দুই গোত্রের আদি মানবকে একই "হোমিনিড" গোষ্ঠী তথা ঋজু মানবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য পিকিং মানবকে জাভা মানবের পরবর্তী ও উন্নততর সংস্করণ মনে করা হয়। চীনের রাজধানী পিকিং

www.pathagar.com

শহরের ৪০ মাইল দূরে চুকুতিয়েন গ্রামের নিকট একটি বিরাট গুহায় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম পিকিং মানবের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ফুটবল মাঠের মত লম্বা এই গুহায় বহুকাল থেকে পিকিং মানব বাস করত বলে মনে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে এই গুহা থেকে অনধিক ৪০ জন পিকিং মানবের অশ্মীভূত খুলি, দাঁত, মুখের অস্থি এবং হাত ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। যুদ্ধের পর আরও বেশ কিছু জীবাশ্ম ঐ স্থানে পাওয়া যায়। পিকিং মানবের মাথার ও চেহারার গঠন অনেকটা জাভা মানবের অনুরূপ (চিত্র—৭খ ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তারও স্পষ্ট ভ্রূঅস্থি, ঢালু কপাল এবং সম্মুখদিকে প্রক্ষিপ্ত চোয়াল ছিল। তবে পিকিং মানবের মাথার খুলি বা করোটি অপেক্ষাকৃত গোলাকার ও বৃহৎ। পিকিং মানবের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে তার করোটির গড় ধারণক্ষমতা ১০৭৫ ঘন সেন্টিমিটার অনুমান করা হয়। এই ভিত্তিতে পিকিং মানব জাভা মানবের তুলনায় অধিক দক্ষ ও মানসিক দিক দিয়ে উন্নততর ছিল। পিকিং মানবের ছেদক ও অন্যান্য দাঁত আধুনিক মানবের দাঁত অপেক্ষা বড়, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা মানব-সম ছিল।

পিকিং মানবের প্রাপ্তিস্থান চুকুতিয়েন গুহা তাদের নিয়মিত আবাসস্থল ছিল, না তারা মাঝে মাঝে সেখানে থাকত, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পিকিং মানব ঐ সকল গুহা বহু যুগ ধরে ব্যবহার করেছে। গুহার ভেতর জমাকৃত আবর্জনা র মাঝে সহস্রাধিক ভাঙ্গা ও দগ্ধ অস্থি এবং ভস্ম পাওয়া গিয়েছে। এর সাথে আরও পাওয়া গিয়েছে বহু হাতিয়ার। এসকল অস্থি ও হাতিয়ার পিকিং মানবের উন্নততর সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। সে খুব সম্ভবত পশু শিকারে বেশ পারদর্শী ছিল এবং বিভিন্ন জাতীয় পশু যেমন হরিণ, ভেড়া, ঘোড়া, উট ইত্যাদি শিকার করত। এছাড়া চুকুতিয়েন গুহার অস্থিসম্ভারে হাতী, গণ্ডার, মহিষ ও বাইসনের অস্থিও পাওয়া গিয়েছে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পিকিং মানব বেশ চতুর ও দক্ষ শিকারী ছিল এবং সে মূলত মাংসভোজী ছিল।

পিকিং মানবের অন্যতম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তার আগুনের ব্যবহার। সে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে হয়ত জানত না, কিন্তু আগুনের ব্যবহার তার

www.pathagar.com

জীবনধারায় এক স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। গুহার মাঝে আগুন ধরাবার কোন সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা হয় যে গুহার নিকটবর্তী লিগনাইট হয়ত মাঝে মাঝে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রজ্জলিত হলে কিংবা বজ্রপাতের ফলে গাছে আগুন ধরে গেলে পর পিকিং মানব সেই আগুন তখন ব্যবহার করত। সে খুব সম্ভবত শীত নিবারণ ও মাংস পোড়াবার জন্য আগুন ব্যবহার করত।

পিকিং মানব জাভা মানব অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধনী প্রস্তুত ও ব্যবহার করেছে। তবে বেশীর ভাগ সাধনী বেশ স্থূল ও অমার্জিত। চুকু-তিয়েন গুহার আশেপাশে যে প্রস্তর পাওয়া যেত সে সকল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত বেশ কিছু সাধনী পিকিং মানবে অশ্মীভূত ধ্বংসাবশেষের সাথে পাওয়া গিয়ছে। এসকল সাধনী মসৃণ করা, চিরা, কাটা ছিদ্র করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হ'ত।

সবশেষে, পিকিং মানব স্বগোত্রভোজী ছিল বলে মনে করা হয়। চুকুতিয়েন গুহায় প্রাপ্ত মাথার খুলি ও অস্থি পরীক্ষা করে বুঝা যায় যে, স্বগোত্রীয় মানুষের মাথার মগজ ও অস্থিমজ্জা পিকিং মানবের আহার্য ছিল। তবে অনেকে মনে করেন যে এই স্বগোত্রভোজন (cannibalisn) নিয়মিত খাদ্যা-ভ্যাস ছিল না, বরং তা শাস্ত্রীয় আচারগত প্রথারূপে প্রচলিত ছিল।

অন্যান্য ঋজু মানব ও ঋজু মানবের সময়কাল

আফ্রিকার আলজিরিয়া এবং টানজানিয়ার ওলডুভাই গিরিখাতে ঋজু মানবের অশ্মীভূত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ঋজু মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে (চিত্র—৮ পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঋজু মানব সম্ভবত ১০ লক্ষ বছর পূর্বে প্রথম আবির্ভূত হয়। তবে তার স্থিতীকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। মনে করা হয় যে, ঋজু মানব ভূপৃষ্ঠে প্রায় ৫ লক্ষ বছর বিরাজ করেছে এবং এই স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় আন্ত-হিমযুগের (মিন্‌ডেল্-রিস্) সমকালীন। যেসকল স্থানে ঋজু মানব পাওয়া গিয়েছে তার পরিবেশ বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, ঋজু মানব সারারণতঃ ঈষদুষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে বসবাস করত।

www.pathagar.com

চিত্র—৮ ঃ জীবাশ্ম মানবের ভৌগোলিক বিস্তারণ

www.pathagar.com

নিয়ানডারথাল মানব (Neanderthal Man)

ঋজু মানবের প্রচুর অশ্মীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেলেও তার পরবর্তী সময় অর্থাৎ তিন লক্ষ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের বিশেষ কোন প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। এই সময়কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিজ্ঞানীদের মতে এই সময় ঋজু মানব বিবর্তনের মাধ্যমে হোমো স্যাপিয়েন্স্ (Homo Sapiens) বা আধুনিক মানবে পরিণত হয়। মানব-জাতির ক্রমবিকাশে উপরে উল্লিখিত ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটে যখন প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্বের কিছু জীবাশ্ম মানবের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সমকালীন আধুনিক মানবের মাত্র এক পর্যায় পূর্বের এই আদি মানবগোষ্ঠী সাধারণভাবে নিয়ানডারথাল মানব নামে পরিচিত। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম নিয়ানডারথাল মানবের অশ্মীভূত কঙ্কাল পাওয়া যায়। এই জীবাশ্মের প্রাপ্তিস্থান জার্মানীর নিয়ানডারথাল উপত্যকার নামে এই আদি মানবের নামকরণ করা হয়। বস্তুতপক্ষে, ইউরোপে নিয়ানডারথাল মানবের বেশ বিস্তৃত বসবাস ছিল বলে মনে হয় কারণ ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে তাদের ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপ ব্যতীত উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া (রাশিয়া) এবং জাভা (ইন্দোনেশিয়া) দ্বীপেও নিয়ানডারথাল মানবের অশ্মীভূত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে (চিত্র—৮)। এই বিস্তারণের একটি বিশেষ তাৎপর্য হ'ল যে, নিয়ানডারথাল মানব বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও পরিবেশে বসবাস করতে সক্ষম ছিল। নিয়ানড়ারথাল মানবের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে এক লক্ষ বছর পূর্ব থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত অনুমান করা হয়। এই সময়কালের শুরুতে তৃতীয় আন্ত-হিমযুগের (রিস্-উর্ম্) সূচনা হয় এবং শেষের দিকে চতুর্থ হিমযুগের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটে।

নিয়ানডারথাল মানবের ব্যাপক ভৌগোলিক বিস্তৃতির জন্য তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যে কিছুটা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে প্রায় অসংখ্য নিয়ান-ডারথাল মানবের দেহাবশেষ থেকে এই আদি মানবের শারীরিক গঠন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা করা সম্ভব হয়েছে (চিত্র—৯)। সমকালীন আধুনিক মানবের সাথে নিয়ানডারথাল মানবের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

www.pathagar.com

সে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারত। সম্মুখভাগ থেকে তার চেহারা বেশ বড় মনে হয়। চোখের কোটর বড় এবং কপাল বেশ নীচু ও ঢালু ছিল। এছাড়া নিয়ানডারথাল মানবের চোখের উপর প্রক্ষিপ্ত ভ্রূঅস্থি এবং ছোট চিবুক লক্ষণীয়। অবশ্য নিয়ানডারথাল মানবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার করোটির ধারণক্ষমতা। খুব সম্ভবত এই ধারণ-ক্ষমতা সমকালীন আধুনিক মানবের ন্যায় ছিল—প্রায় ১৩০০ থেকে ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার। অতীতে নিয়ানডারথাল মানবকে বনমানুষের সাথে একগোত্রীয় মনে করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর তাকে "হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌" গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

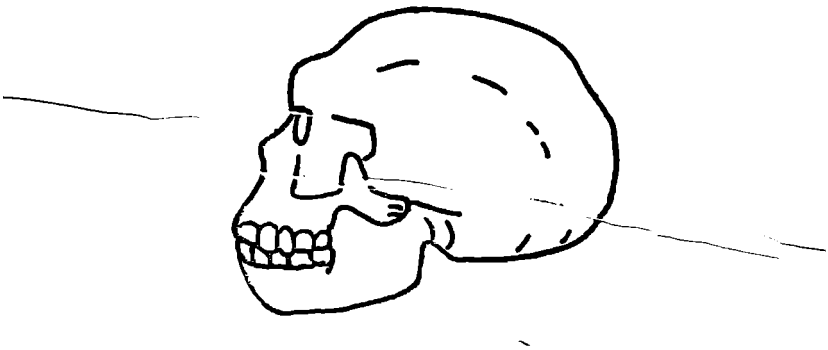

চিত্র —৯ঃ নিয়ানডারথাল মানবের করোটি

সংস্কৃতি ঃ ঋজু মানবের ন্যায় নিয়ানডারথাল মানবও বিবিধ বস্তু ব্যবহার করে হাতিয়ার নির্মাণ করেছে। কিন্তু তার মধ্যে কেবলমাত্র প্রস্তরের হাতিয়ার সমূহই পাওয়া গিয়েছে। নিয়ানডারথাল মানবের নির্মিত প্রস্তর হাতিয়ার সামগ্রিকভাবে "মুস্টেরীয়" (Mousterian) শিল্প নামে পরিচিত। ফ্রান্সের "লে মুস্টিয়ার" (Le Moustier) নামক স্থানের নামে ঐ নামকরণ করা হয়েছে। এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ফলক হাতিয়ার বা flake tools। একটি কঠিন প্রস্তরখণ্ডে অন্য প্রস্তর দ্বারা বারবার আঘাত করার ফলে যে প্রস্তর ফলকসমূহ ভেঙ্গে আসে, সেই ফলকসমূহ হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হ'ত।

www.pathagar.com

নিয়ানডারথাল মানব সম্ভবত ফলক হাতিয়ার প্রস্তুত করার কৌশলে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিল এবং বেশ ছোট ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত ফলকও তারা তৈরী করতে পারত। নিয়ানডারথাল মানবের হাতিয়ার সম্ভার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। অবশ্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এসকল হাতিয়ার সাধারণতঃ পশু শিকার ও জবাই, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, এবং অন্যান্য হাতিয়ার তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত হ'ত।

নিয়ানডারথাল মানব সম্বন্ধে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, তাতে তাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে নিয়ানডারথাল মানব খুব সম্ভবত পরলোক সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনা করত। নিয়ানডারথাল কবরসমূহ পরীক্ষা করে বুঝা যায় যে, সেখানে বেশ সুপরিকল্পিতভাবে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। এ সকল কবরে লাল মাটি ও ফুলের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্ভবত একটি শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠানের সমতুল্য ছিল। নিয়ানডারথাল মানবের যদি মৃত্যু তথা পরলোক সম্বন্ধে কোন ধারণা থেকে থাকত, তবে প্রচলিত অর্থে "ধর্ম" সম্পর্কেও তার হয়ত কিছু ধ্যান ধারণা ছিল। নিয়ানডারথাল মানব কোন কোন জীবজন্তুকে তাদের সামাজিক জীবনে যে স্থান দিয়েছিল, তা কেবলমাত্র পূজাপদ্ধতির আচার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকগুলি নিয়ানডারথাল গুহায় ভল্লুকের মাথার খুলি বিশেষভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তাদের বসবাসের জায়গায় ভল্লুকের খুলি জমা করার রীতি কোন শিকার সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় আচার বলেও অনুমান করা হয়। পরলোক সম্পর্কে ধারণা এবং শিকার সম্বন্ধীয় ম্যাজিকে সম্ভাব্য বিশ্বাস একথারই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রত্যক্ষভাবে যা পর্যবেক্ষণ করা যায় না, সে সম্পর্কে কল্পনা করার সামর্থ্য তার ছিল। মানব-ইতিহাসে এ জাতীয় ক্ষমতার এটাই সর্বপ্রথম নিদর্শন। উল্লেখ্য যে, নিয়ানডারথাল মানবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেবলমাত্র মৃতদেহ সমাধিস্থ করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কোন কোন দেহাবশেষে যে বিকৃতি ও স্বেচ্ছাকৃত বিনাশ দেখা গিয়েছে, তা নিয়ানডারথাল মানবের স্বগোত্রভোজন (cannibalism) প্রথার আভাষ দেয়। অবশ্য স্বগোত্রভোজন একটি নিয়মিত ঘটনা ছিল অথবা বিশেষ কোন আচারানুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন।

www.pathagar.com

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে নিয়ানডারথাল মানবের স্বগোত্রভোজন তাদের শাস্ত্রীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্ভবত নিয়ানডারথাল মানব নিজ জাতির মৃতদেহকে নিয়মিত খাদ্যদ্রব্যের সম্পদ বলে মনে করত না।

নিয়ানডারথাল মানবের কোন বাক্‌শক্তি বা ভাষা ছিল কি না সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। কয়েক বছর আগে নিয়ানডারথাল কঙ্কালের বাক্‌নালী এবং ছোট শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক আধুনিক মানব এবং শিম্পাঞ্জীর বাক্‌নালীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। এতে মনে হয় যে, নিয়ানডারথাল মানব সম্ভবত বেশ ধীরে ধীরে কথা বলতে পারত অর্থাৎ নিয়ানডারথাল সংস্কৃতিতে হয়ত একপ্রকার অপরিণত ভাষার অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য বিস্তারিত গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত নিয়ানডারথাল মানবের বাক্‌শক্তি বা ভাষা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

নিয়ানডারথাল মানবের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটল তা বলা কঠিন। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে নিয়ানডারথাল মানবের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ক্রমশ বিবর্তনমূলক পরিবর্তন শুরু হয় এবং পরিণামে সে রূপান্তরিত হয়ে "হোমো স্যাপিয়েন্‌স্ স্যাপিয়েন্‌স্" (Homo sapiens sapines) বা সমকালীন আধুনিক মানবে পরিণত হয়। অপর একদল বিজ্ঞানীর মতে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসকারী নিয়ানডারথাল মানবের এক মিশ্র উপদল ক্রমশ প্রচরণের মাধ্যমে ইউরোপীয় এলকার "বিশুদ্ধ" নিয়ানডারথাল মানবের আবাসভূমি দখল করে নেয় এবং পরিশেষে শেষোক্ত মানবগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়। উপরোক্ত দুটি মতবাদই বিতর্কমূলক এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে নিয়ানডারথাল মানব আধুনিক মানবের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ কি না সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়।

হোমো স্যাপিয়েন্‌স্ স্যাপিয়েন্‌স্ (Homo Sapiens Sapiens)

প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে আনুমানিক চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে হোমো স্যাপিয়েন্‌স্ স্যাপিয়েন্‌স্ বা সমকালীন আধুনিক মানবের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কালের পর নিয়ানডারথাল মানবের আর কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। সমকালীন আধুনিক মানবের অশ্মীভূত দেহাবশেষ ও সাংস্কৃতিক সম্ভার ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ গুহায় আবিষ্কৃত হয় এবং সেজন্য চল্লিশ হাজার

www.pathagar.com

বছর পূর্ব থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের সমকালীন আধুনিক মানবকে (হোমো স্যাপিয়েন্স্ স্যাপিয়েন্স্) সামগ্রিকভাবে ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানব নামে পরিচিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক ক্রো-ম্যাগ্নন্ দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমান মানবজাতির মধ্যে যে শারীরিক বৈচিত্র্য দেখা যায়, ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানবের মধ্যেও তা ছিল বলে মনে হয়। ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানব সর্বশেষ হিমযুগে (উর্ম্) আবির্ভূত হয়। এই সময়-কালকে ভূতাত্ত্বিকগণ উচ্চতর (upper) প্লাইস্টোসিন যুগ নামে অভিহিত করেন, এবং ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানব কর্তৃক নির্মিত হাতিয়ারশিল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের (upper paleolithic Age) শিল্প নামেও পরিচিত। অর্থাৎ ক্রো-ম্যাগ্নন্ সংস্কৃতি ও উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি সমার্থক।

ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানবের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বর্তমানকালের আধুনিক মানবের অনুরূপ। অপরদিকে নিয়ানডারথাল বা ঋজু মানবের সাথে তার যে প্রভেদ দেখা যায় তার ভিত্তিতেই ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানবকে সমকালীন আধুনিক মানব নামে আখ্যায়িত করা হয়। ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানবের জঙ্ঘাস্থিতে (thish bone) পূর্ববর্তী আদি মানবের ন্যায় কোন বক্রতা ছিল না এবং পায়ের গঠন অপেক্ষাকৃত তনুদেহী ছিল। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক আধুনিকী-করণ ক্রো ম্যাগ্নন্ মানবের মাথার খুলিতে পরিলক্ষিত হয়। ক্রো-ম্যাগ্-ননের মস্তিষ্কের আধার গোলাকৃতি ছিল, এবং কপাল পূর্বের ন্যায় ঢালু ছিল না। উল্লেখ্য যে, ক্রো-ম্যাগ্ননের চোখের উপর আদি মানবের ন্যায় কোন প্রলম্বিত ভ্রূঅস্থি ছিল না। তার মাথার খুলি পরীক্ষা করে মনে হয় যে ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানবের করোটির ধারণক্ষমতা বর্তমান কালের মানুষের সমপরিমাণ ছিল। এছাড়া তার দাঁত, চোয়াল ও চিবুকও বর্তমান মানুষের অনুরূপ ছিল।

আধুনিক কালে পৃথিবীর যে যে স্থানে মানুষের বসবাস আছে, সে সকল স্থানে উচ্চতর প্লাইস্টোসিন্ যুগে মানবজাতির বিস্তৃতি ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ও শিল্পকলাতে আঞ্চলিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি তাই পূর্বতন সংস্কৃতির তুলনায় অত্যন্ত বেশী জটিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এই সংস্কৃতির নিদর্শন প্রধানত

www.pathagar.com

ভূমধ্য সাগরের উপকূল, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তর আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাপ্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্থি ও প্রস্তর হাতিয়ার। লম্বা প্রস্তর নির্মিত ছুরি এদের মধ্যে অন্যতম, এবং এসকল ছুরির একদিক ভোঁতা ও অপরদিক তীক্ষ্ণ ধারালো হ'ত। উত্তর আফ্রিকায় আটত্রিশ হাজার বছর পূর্বের এই জাতীয় ছুরি পাওয়া গিয়েছে। ঐ যুগে শিকারের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ারসমূহও যথেষ্ট জটিল ও কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে তীর, ধনুক, বর্শা, হারপুন (harpoon) এবং পাথরের বল (ball) সংযোজিত একপ্রকার 'ল্যাসো" (lasso) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক নিদর্শন অরিগনেশীয় (Aurigancian) সংস্কৃতি। ফ্রান্সের অরিগ্‌নাক্ নামক স্থানের নামানুসারে এই সময়কালের নামকরণ করা হয়েছে, তবে অরিগনেশীয় সংস্কৃতির নমুনা আফগানিস্তান থেকে স্পেন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এই সংস্কৃতি দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতে সূচিত হয় এবং পরে তা ইউরোপে প্রসার লাভ করে। অরিগনেশীয় সংস্কৃতির হাতিয়ার সম্ভারে খোদাই করা এবং মসৃণ করার জন্য বিশেষ যন্ত্রাদি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সময়কালের পরবর্তী সংস্কৃতি গ্রাভেটীয় (Gravettian) নামে অভিহিত। গ্রাভেটীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ রাশিয়া থেকে আরম্ভ করে মধ্য ইউরোপ হয়ে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য নমুনা একধরনের সরু ছুরি এবং সম্ভবত এই ছুরি কোন প্রকার বাঁটে (handle) খাপ খাওয়ানোর কৌশল প্রচলিত ছিল। গ্রাভেটীয় হাতিয়ার সম্ভারে অস্থি ও হাতীর দাঁতের তৈরী বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীও পাওয়া গিয়েছে। অস্থি দ্বারা সূঁচ তৈরী করা হ'ত এবং সম্ভবত তা বস্ত্রবয়ন কাজে ব্যবহৃত হ'ত। এ ছাড়া গ্রাভেটীয় সময়কালে ব্রেসলেট, মালা, পিন ইত্যাদি অলঙ্কার নির্মাণে অস্থি ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় নিদর্শন হচ্ছে নারীদেহের ছোট ছোট প্রতিমূর্তি। এসকল প্রতিমূর্তির কোন কোন নিদর্শন ম্যামথ্ (mammoth) জন্তুর দাঁত দ্বারা নির্মিত; আবার অনেকক্ষেত্রে তা আগুনে পোড়ানো মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, এই শেষোক্ত পদ্ধতি দ্বারা পৃথিবীর প্রাচীনতম মৃৎশিল্পের সূচনা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এসকল

www.pathagar.com

নারীমূর্তিকে "ভেনাস" নামকরণ করেছেন; এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সকল প্রতিমূর্তিতে নারীদেহের যৌনতাকে বেশী প্রকটভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ফ্রান্স ও ইটালী থেকে সুদূর সাইবেরিয়া পর্যন্ত গ্রাভেটীয় কালের এ জাতীয় নারী প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ মানব যে সকল জীবজন্তু শিকার করত তাদের মধ্যে পশমী ম্যামথ্ বা অতিকায় হাতী এবং বলগাহরিণ অন্যতম। উভয় প্রকার পশুই হিমযুগের শীতল পরিবেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। অধিকন্তু, বল্‌গাহরিণ দলগতভাবে বসবাস করত, তাই ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ মানবের পক্ষে তাদের শিকার করা সহজতর হ'ত। বলগাহরিণ শিকার যে সময়কালে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল, তা ম্যাগডালেনীয় (Magdalenian) সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতির সমকাল সতেরো হাজার বছর পূর্ব থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর নমুনা ফ্রান্স থেকে পোলাণ্ড পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এ সময়কালের হাতিয়ার সম্ভারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে হরিণশৃঙ্গ বা অস্থি দ্বারা নির্মিত কাঁটাযুক্ত হারপুন (harpoon)। বল্‌গাহরিণ শিকারের যে সকল তথ্য উত্থিত হয়েছে তাতে মনে হয় যে ম্যাগডালেনীয় কালে বল্‌গাহরিণের উপর নির্ভরশীল ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ মানব বস্তুত শিকারী নয় বরং পশুপালক ছিল। বড় বড় পশুপালের সংরক্ষণ এবং সুবিবেচিত ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ক্রো ম্যাগ্‌নন্ মানবের বিবিধ উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হ'ত। ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ মানব সম্ভবত পরিবার থেকে বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সমকালীন আধুনিক মানবের অপর একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক কীর্তি তার গুহা চিত্রশিল্প। এ সকল গুহাচিত্র প্রধানত স্পেন ও ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যুগের চিত্রশিল্প নিঃসন্দেহে প্রচুর প্রশংসার দাবী রাখে। গুহার দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন রং এর সুদক্ষ সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেয়ালে প্রায় প্রোথিত অবস্থায় মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। গুহা চিত্রশিল্পে জন্তুর প্রতিকৃতিই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এবং শিকার সংশ্লিষ্ট "ম্যাজিক" ও আচার অনুষ্ঠান এর কারণ হতে পারে। কোন কোন চিত্রে ছোট ছোট মানুষের মূর্তিও স্থান পেয়েছে এবং এসকল মানুষ শিকারী ও শিকারদলের নেতার প্রতিকৃতি হতে পারে বলে

www.pathagar.com

অনুমান করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ চিত্রশিল্পীর প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল জীবজন্তু শিকার। তাছাড়া এসকল চিত্রশিল্প যেহেতু অন্ধকার গুহাদেয়ালে সৃষ্ট হয়েছে, তাই তার ব্যবহার হয়ত সৌন্দর্যবৃদ্ধিসাধন ছিল না। ম্যাজিক বা ধর্মবিশ্বাস ও পূজা আচার (cult) থেকেই সম্ভবত গুহা চিত্রশিল্প জন্ম নেয়।

ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ মানবের সাংস্কৃতিক নিদর্শন প্রধানত ইউরোপে পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও সমকালীন আধুনিক মানব বসবাস করত। উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক নিদের্শনসহ সমকালীন আধুনিক মানবের দেহাবশেষ চীন, ইন্দোনেশীয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, এবং অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য ইউরোপে প্রাপ্ত নিদর্শনের তুলনায় এসকল প্রাপ্তি নিতান্তই অপ্রতুল। সমকালীন আধুনিক মানবের যে যুগে বসবাস ছিল সেই যুগেই এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে তৎকালীন শুষ্ক বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে আমেরিকার আলাস্কায় প্রবেশের মাধ্যমে মানবজাতি আমেরিকায় প্রসার লাভ করে। বিজ্ঞানীদের মতে এই ঘটনা সম্ভবত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাযুক্তিক উন্নয়ন—১

হাতিয়ার ও দক্ষতা মানবসংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক। মানুষ তার ইতিহাসে সকল সময় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে এবং এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ প্রযুক্তিবিদ্যা (technology) জন্ম নিয়েছে। মানবসমাজের অতি প্রাচীন সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই প্রাযুক্তিক উন্নয়নধারা অত্যন্ত বিচিত্র। আদি মানবের নিকট প্রস্তর ও শিলাখণ্ড একমাত্র সহজপ্রাপ্ত কাঁচামাল ছিল; এবং সেজন্য তার প্রযুক্তি স্বভাবতই প্রস্তরভিত্তিক হয়। মানুষ যখন হাতিয়ার নির্মাণ ও ব্যবহার করতে শিখল, তখন তার পরিপার্শ্বে ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রস্তর ও শিলা সংগ্রহ করে সে হাতিয়ার প্রস্তুত করতে শুরু করল। সুতরাং মানবসংস্কৃতির প্রাযুক্তিক উন্নয়নধারার প্রথম সোপান প্রস্তর যুগ নামে পরিচিত।

প্রস্তর যুগ (Stone Age)

মানুষের অধিকাংশ হাতিয়ার এযুগে প্রস্তর ও শিলাখণ্ড দ্বারা নির্মিত হ'ত। অবশ্য হাতির দাঁত, হরিণশৃঙ্গ, কাঠ এবং বিভিন্ন পশুর হাড় ব্যবহারেরও এসময় প্রচলন ছিল। প্রস্তর যুগ পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময় সূচিত হয়নি—প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান কালেও কিছু কিছু মানবগোষ্ঠী প্রস্তরযুগে বসবাস করে; যেমন, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত দক্ষিণ ফিলিপাইনের গুহাবাসী "তাসাদায়" সম্প্রদায়।

প্রস্তর যুগকে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palcolithic Age) এবং নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। প্রাচীন প্রস্তর যুগে প্রধানত প্রস্তর ফালি ফালি করে ভেঙ্গে হাতিয়ার নির্মিত হ'ত এবং নব্য প্রস্তর যুগে মসৃণ করা প্রস্তর হাতিয়ারের নির্মাণের প্রচলন হয়।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

এই যুগে তিন প্রকার প্রস্তর হাতিয়ার নির্মাণের ধারা প্রচলিত ছিল। এই ধারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে। প্রথম ধারা হচ্ছে শাঁস হাতিয়ার (core tools), যা অনেক সময় "হস্তকুঠার" নামেও পরিচিত। একটি শক্ত প্রস্তরখণ্ডকে দু'পাশ থেকে ভেঙ্গে তার একটি দিক বেশ তীক্ষ্ণ ধারালোভাবে তৈরী করা হ'ত এবং সর্বপ্রকার কাটাছেঁড়ার কাজে এই 'হস্তকুঠার' ব্যবহৃত হ'ত। দ্বিতীয় ধারার হাতিয়ার ফলক হাতিয়ার বা flake tools। বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে আঘাতের দ্বারা ফলক (flake) সৃষ্টি করে এ জাতীয় হাতিয়ার নির্মাণ করা হ'ত; এর এক পার্শ্ব ছুরির মত ধারালো হ'ত। তৃতীয় ধারার হাতিয়ার হচ্ছে কর্তন হাতিয়ার বা chopper (chopping tools)। এ সকল হাতিয়ার নুড়ি পাথর বা অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড থেকে প্রস্তুত করা হ'ত। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার হাতিয়ার ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে এবং চীন, বার্মা ও জাভা দ্বীপে তৃতীয় ধারার হাতিয়ারের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগকে শিলাস্তর ও হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনটি পর্যায়ক্রমিক সময়কালে ভাগ করা হয়; নিম্নতর, মধ্যবর্তী ও উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগ। কোন কোন বিজ্ঞানী এই তিন সময়কালের পূর্ববর্তী একটি উষা প্রস্তর যুগের (Eolithic Age) কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ যুগের প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ অত্যন্ত স্থূল এবং অমার্জিত ধরনের ছিল এবং অনেকে সেগুলি মানুষের নির্মিত বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Lower Paleolithic Age): প্রাচীন প্রস্তর যুগ প্লাইস্টোসিন তুষার যুগের সমসাময়িক। এই তুষার যুগ চারটি হিমযুগে বিভক্ত এবং প্রতি হিমযুগের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উষ্ণ-সময়কাল আন্তঃহিমযুগ নামে পরিচিত। নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তরযুগ প্রথম হিমযুগের (গুন্জ্ : Gunz) শুরুতে (প্রায় দশ লক্ষ বছর পূর্বে) সূচিত হয় এবং তৃতীয় আন্তঃহিমযুগ পর্যন্ত (প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্বে) এর স্থিতিকাল ধরা হয়ে থাকে। এই যুগের প্রথম ভাগে কেবলমাত্র নুড়ি হাতিয়ারের (pebble tools) নির্মিত হ'ত। এর পরবর্তী পর্যায়ে শাঁস হাতিয়ারের (core tools) নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং শেষ পর্যায়ে ফলক হাতিয়ার বা flake tools এর প্রচলন শুরু হয়। দ্বিতীয় আন্তঃহিমযুগটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী ছিল এবং ঐ সময় বর্তমান অপেক্ষা পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণতর ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী ও বন্য শূকর ইত্যাদি পশু

www.pathagar.com

ব্যাপক সংখ্যায় পাওয়া যেত। ঐ সময়ের মানুষ এসকল পশুর হাড় ও দাঁতও ব্যবহার করত।

মধ্যবর্তী প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Middle Paleolithic Age) : চতুর্থ হিমযুগে (উর্ম্ : Wurm) এক নতুন ধারার হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতির সূচনা হয়। এই ধারায় প্রধানত ফলক হাতিয়ার (flake tools) নির্মিত হ'ত। এই সময় ফলক হাতিয়ার দ্বারা বিবিধ কাজ সম্পাদনের জন্য ঐ হাতিয়ারের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এই যুগে পশু চামড়া দ্বারা পোশাক তৈরীর জন্য হাড় থেকে নির্মিত সূঁচের নমুনা পাওয়া গিয়েছে।

উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Upper Paleolithic Age) : এ যুগের হাতিয়ার শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্লেড হাতিয়ার (blade tools)। একটি প্রস্তরখণ্ডকে দু'পাশে সমান্তরালভাবে ভেঙ্গে ছুরির ন্যায় ধারালো ব্লেড হাতিয়ার নির্মিত হ'ত। এ সময়কালে ব্লেড হাতিয়ার ব্যতীত মৎস শিকারের জন্য বর্শা ও হুক এবং চামড়া দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য কাঠ ও হাড়ের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। উচ্চতর প্রাচীন প্রস্তরযুগে জলবায়ু প্রধানত শীতপ্রধান ছিল এবং মানুষ অধিকাংশ সময় গুহায় বাস করত। গুহার দেয়ালে এ যুগের অঙ্কিত অনেক চিত্রকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া এ সময়কালের মানুষ প্রস্তর দ্বারা ছোট ছোট নারীমূর্তি এবং বিভিন্ন পশুর খোদাই করা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করেছে। চতুর্থ হিমযুগের (উর্ম্ : wurm) শেষে পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণতর ও আর্দ্র হয়ে উঠে এবং মানুষ পশু শিকার থেকে মৎস শিকারের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়। তার ফলে প্রস্তর হাতিয়ারের প্রাচুর্য কমে আসে এবং চতুর্থ হিমযুগের শেষভাগ (১২,০০ খ্রীঃ পূঃ) প্রাচীন প্রস্তরযুগের অন্তিম পর্যায় বলে মনে করা হয়।

নব্য প্রস্তর যুগ

প্রস্তরযুগের যে পর্যায়ে ঘর্ষণ দ্বারা মসৃণ হাতিয়ার নির্মাণের কৌশল প্রচলিত হয়, তাকে নব্য প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে অবশ্য নব্য প্রস্তরযুগের মূল পরিচয় হচ্ছে ঐ সময়কালে মৃৎশিল্পের জন্ম ও কৃষিকাজের সূচনা। কৃষির উদ্ভবের ফলে মানবজীবনে যে ব্যাপক

www.pathagar.com

পরিবর্তন আসে, তার জন্য এই ঘটনা নব্য প্রস্তরযুগকে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

নব্য প্রস্তরযুগে কৃষিকাজের উদ্ভাবনকে অনেক সময় একটি "বিপ্লব" নামে অভিহিত করা হয় কারণ এই উদ্ভাবন মানুষের সম্মুখে সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনধারা উপস্থাপন করে। মানুষ এই প্রথম নিজ খাদ্যসম্ভার নিজে উৎপাদন করতে শুরু করে এবং ক্রমশ প্রকৃতির উপর তার নির্ভরশীলতার পরিমাণ কমে আসে। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সুবিধার জন্য মানুষ গোষ্ঠীগতভাবে এক স্থানে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং কৃষিকাজের উদ্ভবের ফলস্বরূপ ছোট ছোট গ্রাম বসতির জন্ম হ'ল। স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করার সুবিধা হওয়ায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ উদ্ভাবিত ও প্রসারিত হয়। পরিশেষে, কৃষিপদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে সাথে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদিত হয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের সূচনা হয়।

নব্য প্রস্তরযুগ আনুমানিক দশ থেকে বার হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়। এই যুগকে "বৈপ্লবিক যুগ" বলার অর্থ এই নয় যে, এ সময় কোন আকস্মিক বা বলপূর্বক পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে পূর্ববর্তী বহু সহস্র বছরের মানব-ইতিহাসের তুলনায় এযুগে মানুষের জীবনধারায় এক মৌলিক রূপান্তর ঘটে, এবং কৃষি উদ্ভাবন তার মূল কারণ। সর্বপ্রথম খুব সম্ভবত ঐ সকল মানব-গোষ্ঠী কৃষিকাজ শুরু করে যাদের পশু শিকার (hunting) ও সংগ্রহ (gathering) ছিল মূল পেশা এবং কৃষিকাজ ছিল একটি আনুষঙ্গিক কৌতূহল। নিঃসন্দেহে ঐ সময় কৃষিপদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আদিম এবং উৎপাদিত শস্যের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। পৃথিবীর প্রথম কৃষকগণ হয়ত সূক্ষ্ম যষ্টি বা লাঠি দ্বারা রোপণ কাজ সমাধা করত এবং কাঠের হাতলে বসানো প্রস্তর নির্মিত কাস্তে দ্বারা ফসল কাটার কাজ করত।

কৃষি উদ্ভব এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট পশু গৃহপালিতকরণের প্রথম পর্যায়ের সঠিক চিত্র রূপায়ণ এখনো সম্ভব হয়নি। অনুমান করা হয় যে পশ্চিম এশিয়ার তথাকথিত "উর্বর চন্দ্রভূমি" বা fertile crescent কৃষি উদ্ভবের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য কোন কোন বিজ্ঞানী কৃষি উদ্ভাবনের স্থানরূপে বিকল্প কেন্দ্রেরও উল্লেখ করেছেন। (এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদে কৃষি উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) পশ্চিম এশিয়ায় গম ও বার্লির আদিম সংস্করণ

www.pathagar.com

এখনো পাওয়া যায়। এখানে আরও পাওয়া যায় আদিম বা বন্য ছাগল, ভেড়া, গরু ও শূকর। সম্ভবত প্রাচীনতম কৃষকগণ আদিম উপায়ে জন্মানো শস্য সংগ্রহ করে তা খাদ্যের জন্য ব্যবহার করত এবং ধীরে ধীরে শস্যবীজ সঞ্চয়ের পর পরিকল্পিত উপায়ে সেই বীজ থেকে ঐ শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা তারা আয়ত্ত করে। খননকাজের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন বসতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং সেখানে নব্য প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এ সকল প্রাচীন জনপদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তুরস্কে চাতাল হুয়ুক, ইরাকে মুলেফাত ও জারমো এবং প্যালেস্টাইনে জেরিকো। এ সকল জনপদে গম ও বার্লি চাষ, কৃষিসংশ্লিষ্ট পাত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার এবং ছাগল ও ভেড়া গৃহপালিতকরণের নমুনা পাওয়া গিয়েছে।

মৃৎশিল্প নব্য প্রস্তরযুগের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাদামাটি থেকে এই যুগে মানুষ সর্বপ্রথম সাধারণ ব্যবহারিক পাত্র নির্মাণ করতে শুরু করে। পাত্রের আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি অজটিল ও স্পষ্টরূপী ছিল। পাত্রের রং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নতর দেখা যায়, তবে এই বিভিন্নতা সম্ভবত যে কাঁচামাল (কাদা) দিয়ে পাত্র নির্মিত হ'ত, তার নিজস্ব রং এর উপর নির্ভর করত। ক্রমশ নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ মৃৎশিল্পে নানাপ্রকার নূতনত্ব আনতে সক্ষম হয় এবং রঙীন ও প্রতিকৃতিতে সজ্জিত পাত্রও নির্মিত হয়। পাত্রের গায়ে জ্যামিতিক ডিজাইন, মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হ'ত। মৃৎশিল্পের চরম উন্নতির সময়কালে পাত্রসমূহে লাল, কমলা, হলদে ও কাল রং এর সমারোহ দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে ঐ যুগের মৃৎপাত্রগুলি সম্ভবত বিরাট চুল্লীতে অত্যধিক গরম আগুনে পোড়ানো হ'ত।

নব্য প্রস্তরযুগের কৃষি উদ্ভব ও পশু গৃহপালিতকরণ অতি দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্তি লাভ করে। অনেক সম্প্রদায় কৃষিকাজ শুরু না করে হয়ত সরাসরি পশুপালকের ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলে পশুশিকার ও সংগ্রহ ক্রমশ কম গুরুত্বপূর্ণ জীবিকায় পরিণত হয়। এই কারণে নব্য প্রস্তর-যুগকে মানব-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সময়কালরূপে গণ্য করা হয়।

তাম্র, ব্রোন্জ, ও লৌহযুগ

নব্য প্রস্তরযুগের শেষ ভাগে ভূপৃষ্ঠের কঠিন ধাতব পদার্থ সম্পর্কে মানুষ প্রথম জ্ঞানলাভ করতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ধাতব পদার্থ উত্তোলন,

www.pathagar.com

আকরিক থেকে ধাতুর পৃথকীকরণ এবং ঐ ধাতু ব্যবহার করে হাতিয়ার প্রস্তুত ইত্যাদি কৌশল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধাতু বা ধাতব পদার্থ ব্যবহার ক্রমশ মানুষকে প্রস্তরের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দেয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই ধাতব যুগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: তাম্র, ব্রোন্জ্ ও লৌহযুগ (Copper, Bronze and Iron Age)।

আনুমানিক 8000 খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) ও মিশরে সর্বপ্রথম তাম্রযুগের সূচনা হয়। ঐ সময় সম্ভবত ধাতু গলানোর বিদ্যা মানুষের ছিল না এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত তাম্র দ্বারা হাতিয়ার নির্মিত হ'ত। মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় প্রায় ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তামার ব্যাপক ব্যবহার এবং তাম্র নির্মিত অলংকারের প্রচলন শুরু হয়। ধাতু গলানোর কৌশল মানুষ ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছিল বলে মনে হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে একটি সংকর ধাতু—ব্রোন্জ্ আবিষ্কৃত হয় এবং ধাতব হাতিয়ার প্রস্তুতে মানুষের ক্ষমতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়ায় প্রথম ব্রোন্জ্ প্রস্তুত করা হয় এবং অতি দ্রুত এই কৌশল পশ্চিম এশিয়ার অন্যত্র এবং দক্ষিণ ইউরোপে প্রসারণ লাভ করে। প্রায় ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রোন্জ্ ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। তাম্র ও ব্রোন্জের ব্যবহার কেবল-মাত্র সাধারণ হাতিয়ার ও অলংকার নির্মাণেই সীমিত ছিল না, বরং এসকল ধাতু দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং কৃষিকাজের যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করা হ'ত।

তাম্র ও ব্রোন্জের পর লৌহ অন্যতম প্রধান ধাতব পদার্থরূপে মানব সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। লৌহযুগের আবির্ভাবে মানুষ তাম্র বা ব্রোন্জ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও টেকসই এক ধাতুর ব্যবহারে পারদর্শিতা লাভ করে। কৃষ্ণ সাগরের তীরে এশিয়া মাইনরে সম্ভবত সর্বপ্রথম লৌহার ব্যবহার শুরু হয়। যদিও এই ধাতুর অস্তিত্ব ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দেও জানা ছিল, কিন্তু প্রায় ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পূর্বে লোহা ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। লৌহযুগের সূচনা ঘটতে কেন এত দেরী হ'ল, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। প্রায় ১০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে লোহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আরও প্রায় আড়াই শত বছর পর ইউরোপ লৌহযুগে প্রবেশ করে। লৌহযুগ পৃথিবীর ইতিহাসে

www.pathagar.com

আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। সামাজিক সংগঠন, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম তথা সমাজের সকল পর্যায়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ ক্রমবিকাশ ঘটে এবং গ্রীস, রোম, চীন ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাচীন ক্লাসিকাল সভ্যতায় লৌহযুগের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া যায়।

কৃষির উদ্ভব

শস্য উৎপাদনের জ্ঞান মানব-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কীর্তি। পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার সাথে সাথে মানুষ ক্রমশ পরিকল্পিত উপায়ে শস্য উৎপাদন করার জ্ঞান অর্জন করে। এ ঘটনা কোন একটি বিশেষ দিনে ঘটে নাই। বহু সহস্র বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলস্বরূপ মানুষ বুনো লতাপাতা বা আগাছাকে গৃহপালিত (domesticate) করে—যা সাধারণতঃ কৃষির উদ্ভব (origin of agriculture) নামে পরিচিত। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে শস্য উৎপাদনের সূচনা করেছে বলে ধারণা করা হয়। কোন্ স্থানে আগে ও কোন্ স্থানে পরে কৃষিকাজের শুরু, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন। তবে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্বতন্ত্রভাবে কৃষিকাজ প্রবর্তনের সম্ভাবনার কথা সবাই উল্লেখ করেন। প্রায় দশ থেকে বিশ হাজার বছর পূর্বে কৃষিকাজের জন্ম কোন একটি "কৃষি বিপ্লব" ছিল না, বরং এটা একটি দীর্ঘায়িত ঘটনা ছিল যখন মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল যে বুনো লতাপাতা সংগ্রহ করার চাইতে তা উৎপাদন করলে অধিক খাদ্য পাওয়া যায়। সম্ভবত, পচে যাওয়া বা অর্ধভুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যের আবর্জনা যখন বসতির নিকট নিক্ষেপিত হ'ত, সেই আবর্জনা থেকে কোন চারা গাছ জন্মাত এবং তাতে কোন ফল বা শস্য উৎপাদিত হ'ত। এরূপ ঘটনা থেকে হয়ত সেখানকার মানুষ অনুমান করতে পারল যে বুনো গাছের শিকড় বা বীজ ঘরের কাছে এনে রোপণ করলে তা থেকে নতুন গাছ জন্মাবে এবং খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে কৃষির উদ্ভব অন্য কোন জীবিকার সাথে সমান্তরালভাবে ঘটেছে এবং তাদের মতে প্রাচীনকালের মৎসজীবী স্থায়ী জনপদ সমূহে সর্বপ্রথম কৃষির উদ্ভব হয়।

www.pathagar.com

চিত্র—১০ শস্য গৃহপালিতকরণ কেন্দ্র

www.pathagar.com

শস্য উৎপাদন গাছের শিকড় বা মূল মাটিতে পুঁতে বা বীজ বপন করে উভয়ভাবে করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, প্রাচীনকালে মানুষ সর্বপ্রথম সমূল শস্যচারা (root crops) রোপণ ও উৎপাদন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বীজ থেকে চারাগাছ উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করে। বীজ বপন করে চাষ করা অধিকতর জটিল, কারণ এই পদ্ধতিতে প্রথমে গাছ থেকে শস্য বা বীজ সংগ্রহ করতে হয়, তারপর কোন কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে কৃষিজমি প্রস্তুত করতে হয় এবং ধারাবাহিকভাবে তারপর বীজ বপন, আগাছা পরিষ্কার, সেচ ও সবশেষে ফসল কাটতে হয়।

কৃষিকাজের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম কোথায় কৃষির উদ্ভব হয়েছিল? বর্তমানে যেটুকু তথ্যাদি আমরা জানি, তাতে কৃষিকাজের একাধিক উৎপত্তিস্থান ছিল বলেই মনে হয় (চিত্র- ১০)। আমেরিকান ভূগোলবিদ কার্ল সাওয়ার তাঁর Agricultural Origins and Dispersal (১৯৫২ খ্রীঃ) গ্রন্থে দাবী করেছেন যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বপ্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়। তাঁর মতে এই আদি কৃষকগণ বুনো গাছের শিকড়, কন্দ বা মূল কেটে মাটিতে পুঁতে দিয়ে শস্য উৎপাদন করত এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা বীজ বপনের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের অভিজ্ঞতা লাভ করল। সাওয়ার মনে করেন যে কৃষিকাজের উদ্ভবের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল এবং ঐ অঞ্চলে সূচিত কৃষিকাজের জ্ঞান ক্রমশ চীন, দক্ষিণ এশিয়া এবং এমনকি আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই অবশ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে কৃষিকাজের উৎসস্থলরূপে সাওয়ারের মতবাদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাঁদের মতে পশ্চিম এশিয়া কৃষিকাজের প্রথম জন্মস্থান। পশ্চিম এশিয়ার এই অঞ্চলটি সাধারণতঃ "উর্বর অর্ধচন্দ্র" বা fertile crescent নামে অতি সুপরিচিত। বর্তমান লেবানন ও ইসরাইল উপকূল থেকে শুরু করে ইরাকের মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারের এই উর্বর অঞ্চল কৃষিকাজের প্রাচীনতম লীলাভূমি মনে করা হয়। চীনের হোয়াংহো নদী উপত্যকা অপর এক স্বতন্ত্র কৃষি উদ্ভব কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে পশ্চিম আফ্রিকা এবং পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় কোন কোন শস্য উৎপাদনের সূচনা হয়েছিল। আবার অন্যদিকে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে সেখানকার

www.pathagar.com

অধিবাসিগণ কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন করে এবং সেখানেও প্রথমে বৃক্ষমূল রোপণ এবং পরে বীজ বপন করে শস্য উৎপাদন সূচিত হয়।

বুনো শস্যকে গৃহপালিতকরণ (domestication) মানুষের জীবনধারায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে মানুষ এক স্থান থেকে অধিক পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'ল এবং পশু শিকার (hunting), যাযাবরী সংগ্রহ (nomadic collecting) ও মৎস শিকার (fishing) অপেক্ষা শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হ'ল। কৃষি উদ্ভবের জন্য দু'টো প্রধান অবস্থার প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কেবলমাত্র স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী শস্য উৎপাদন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারত। এ কারণে অনুমান করা হয় যে মৎসজীবী সম্প্রদায়—যারা স্থায়ীভাবে ছোট ছোট গ্রামে বসবাস করত—কৃষিকাজে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, কৃষি উদ্ভব অনুকূল জলবায়ুতে হওয়া অধিকতর সুবিধাজনক, কারণ ঐ জলবায়ুতে তুষার বা তীব্র শুষ্কতা থাকলে শস্য উৎপাদনের পরীক্ষা চালানো সম্ভব হ'ত না। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল শস্য উৎপাদনের উৎসস্থল বলে মনে করা হয়, সে সকল স্থানের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন ছিল এবং ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য সে-সকল স্থানে শস্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ ছিল।

গার্হস্থ্য শস্যসমূহের উৎসস্থল

কৃষি উদ্ভব সম্বন্ধীয় যে সকল তথ্য এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, তাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শস্যের গার্হস্থ্যকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ অঞ্চলের সমভূমি এবং আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন জলবায়ু কৃষি উদ্ভবের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় সহায়তা করেছে। খুব সম্ভবত দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ধান, ইক্ষু, যব, সোরগাম (sorghum) পাট, কলা, কাঁঠাল, আম, কচু, আদা, হলুদ, ইয়াম্ (চুপড়ি আলু), রুটি ফল (bread fruit), বেগুন, লবঙ্গ, এলাচি ইত্যাদি প্রথম চাষ করা হয়। অপর-দিকে চীনে চা, সোয়াবীন, পীচ, বালি ও যব চাষের সূচনা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া অঞ্চল কৃষি উদ্ভবের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে গম, ধান; বালি, যব, সোরগাম, তুলা ও কফির উদ্ভব হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। আবার পশ্চিম এশিয়াতেও

www.pathagar.com

কয়েক প্রকার গম, বার্লি, যব, রাই, আপেল, চেরী, আঙ্গুর, জলপাই, পেঁয়াজ, তেঁতুল ইত্যাদির সর্বপ্রথম গার্হস্থ্যকরণ হয়। (একই শস্য অনেক সময় বিভিন্ন স্থানে গার্হস্থ্যকৃত হয়েছে বলে তাদের নাম একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।) আমেরিকায় দুটি অঞ্চলে কৃষির উদ্ভব ঘটে: মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য আন্দিজ অঞ্চল। আন্দিজ অঞ্চলে মিষ্টি আলু, চীনাবাদাম, আনারস, কোকো, তামাক ও ক্যাসাভা চাষ শুরু হয়। অপরদিকে ভুট্টা, কুমড়া, শিম, টমেটো ও লঙ্কার জন্মভূমি মধ্য আমেরিকা। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পৃথিবীর অধিকাংশ শস্যেরই মানুষ কর্তৃক গার্হস্থ্যকরণ সম্পন্ন হয়েছিল। গত চার বা পাঁচ শত বছরে কোন উল্লেখযোগ্য নতুন শস্য উদ্ভব হয়নি। বর্তমান যুগে কেবলমাত্র গবেষণার ফলে প্রচলিত শস্যের উচ্চ ফলনশীল বীজ সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে।

পশু গৃহপালিতকরণ

কৃষি উদ্ভবের ন্যায় পশু গৃহপালিতকরণের ইতিহাস সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি আনুমানিক ধারণা করা সম্ভব। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু নদ উপত্যকায় ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দেরও আগে গরু ও আরও কয়েকটি পশুর ব্যবহার সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কি উপায়ে ও কি প্রয়োজনে পশু গৃহপালিতকরণ পদ্ধতির সূচনা হয়েছে, তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, কোন আদি মানবগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশু গৃহপালিত করেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ভিত্তিতে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে কৃষিজীবী কোন মানবগোষ্ঠী সর্বপ্রথম পশু গৃহপালিত করে। কিন্তু সকল পশুই কেবলমাত্র কৃষিজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহপালিত হয়েছে, এমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন যে পশু শিকারী কখনো পশু গৃহপালিত করতে সক্ষম ছিল না, কারণ তার কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। অপরপক্ষে আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে কৃষিকাজের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পূর্বেই কোন কোন মানবগোষ্ঠী তাদের অস্থায়ী বসতির চারপাশে বিচরণশীল ছোট ছোট পশু ও পাখীর সাথে এক সহযোগী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং ক্রমশ ঐ সকল পশু ও পাখী মানুষের পোষ মানে।

www.pathagar.com

পরবর্তী পর্যায়ে হয়ত আরও অন্যান্য কারণবশতঃ যথা, আচারগত প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা বলিদান এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, পশু গৃহপালিতকরণ প্রক্রিয়া আরও সম্প্রসারিত হয়। আবার এটাও সম্ভব যে সুদূর অতীতে কৃষি-জীবী মানুষ হয়ত বন্য পশুর ছোট শিশু নিজ ঘরে নিয়ে এসে প্রথমত কৌতূহলের বশে লালনপালন করে এবং পরে তার দুধ ও মাংস আহারের উপযোগী বিবেচিত হ'লে গৃহপালিতকরণ প্রক্রিয়া আরও পরিবর্ধিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন পশু খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনেও গৃহপালিত হয়।

কুকুর খুব সম্ভবত মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু। ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে দশ হাজার বছর পূর্বে গৃহপালিত কুকুরের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। কুকুরের পর সম্ভবত ছাগল ও ভেড়া গৃহপালিত করা হয়। প্রায় ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মিশরে গৃহপালিত ছাগল ও ভেড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সম্ভবত পশ্চিম হিমালয় ও সংলগ্ন পার্বত্যাঞ্চলে ছাগল ও ভেড়ার উদ্ভব ঘটে। উভয় প্রাণীই প্রথমে দুধ ও মাংসের জন্য গৃহপালিত করা হয় এবং পরে ভেড়ার পশম ও ছাগলের লোম পোশাক ও তাঁবু নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের আটলান্টিক উপকূল থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত প্রাচীনকালে বিচরণশীল বন্য গরুর বংশধর আধুনিক গৃহপালিত গরু। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় গরু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৃহপালিত হয়েছে ; যেমন আমাদের দেশের কুঁজবিশিষ্ট গরু এই উপমহাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গৃহপালিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। শূকর ও ঘোড়ার গৃহপালিতকরণ কেন্দ্র সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা হয় যে, ঘোড়া সম্ভবত মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে এবং শূকর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সর্বপ্রথম গৃহপালিত হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে ঘোড়া ককেসাস পর্বতের নিকট বসবাসকারী কৃষিজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথমে গৃহপালিত হয় এবং পরে তা প্রতিবেশী যাযাবর সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়। উট সম্ভবত পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চলে গৃহপালিত হয় এবং গাধার গৃহপালিতকরণ কেন্দ্র পূর্ব আফ্রিকা। পাখীদের মধ্যে মুরগী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং হাঁস মিশর ও চীনে স্বতন্ত্রভাবে গৃহপালিত হয়।

www.pathagar.com

ভূগোল ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে অতি সাম্প্রতিককালেও এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিবর্তনে সে প্রথমে শিকারী, তারপর পশুপালক এবং শেষে কৃষিজীবি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে তা হয়নি, কারণ কোন কোন মানবগোষ্ঠী শিকারী জীবন ত্যাগ করে সরাসরি শস্য উৎপাদন শুরু করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পশু গৃহপালিত-করণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে। সুতরাং, প্রাচীনকালের শিকারী→পশুপালক→ কৃষিজীবী, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় কোন সত্যতা নেই।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

প্রাযুক্তিক উন্নয়ন—২

লুপ্ত প্রাচীন সভ্যতা

সভ্যতার উষালগ্নে পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। এ সকল অঞ্চলকে প্রাচীন সভ্যতার উৎসভূমি বলা চলে। এদের মধ্যে কতিপয় সভ্যতার কেন্দ্র বহুকাল যাবৎ সমৃদ্ধিশালী থাকে এবং আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে। প্রাচীন জগতের চারটি অঞ্চলে এরূপ সভ্যতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বর্তমানে লোপ পেয়ে গেলেও সভ্যতার জন্মভূমিরূপে সর্বজনস্বীকৃত। এই চারটি লুপ্ত প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার কেন্দ্র হ'ল (১) মেসোপটেমিয়া (ইরাক); (২) নীল উপত্যকা (মিশর) (৩) সিন্ধু উপত্যকা (পাকিস্তান); ও (৪) উত্তর চীন (চিত্র—১১)। এ সকল অঞ্চলে অনুরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; প্রতিটি অঞ্চল বাণিজ্যিক পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত; প্রতিটি অঞ্চলে বা তার সন্নিকটে কৃষি উদ্ভব ও পশু গৃহপালিতকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং প্রতিটি অঞ্চল কোন বড় নদী উপত্যকায় অবস্থিত। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রাচীন সভ্যতাসমূহের অস্তিত্ব ঐ নদীর পানির উপর নির্ভর করত এবং নদীর পানি ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এজন্য উপরোক্ত চারটি প্রাচীন সভ্যতাকেন্দ্রকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়।

মেসোপটেমিয়া

মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। আধুনিক ইরাকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকা সাধারণতঃ মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালে কৃষিকাজের সূচনা এবং পশু গৃহপালিতকরণের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার ফলে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা তাদের যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী-ভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করে। প্রায় ৮০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ

www.pathagar.com

চিত্র—১১ঃ প্রাচীন সভ্যতার উৎসভূমি

www.pathagar.com

পর্যন্ত এখানকার জনসাধারণ ছোট ছোট গ্রামে বাস করত—এ সকল গ্রামের জনসংখ্যা ১০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রায় ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে এ সকল গ্রামের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি ও পশুপালন দ্রুত উন্নততর হতে থাকে। এ সময় উন্নতমানের গম ও বার্লির বীজ ব্যবহার শুরু হয়।

মেসোপটেমিয়ায় প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বের অস্তিমান একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রামের নাম আল উবায়েদ। এই গ্রাম এবং সমকালীন অন্যান্য গ্রামে বেশ সমৃদ্ধিশালী কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া উবায়দীয় মৃৎপাত্রের ব্যাপক প্রসারণ মেসোপটেমিয়ার সর্বত্র বাণিজ্যিক সংযোগ ইঙ্গিত করে। এ সময়কালের সাধারণ ঘরবাড়ী নলখাগড়া ও কাদা-মাটির দেয়ালে এবং খড়ের ছাউনি দ্বারা নির্মিত হ'ত। বড় বড় দালান অর্থাৎ মন্দির বা রাজগৃহ অবশ্য রোদে-পোড়া ইট (adobe) দ্বারা নির্মাণ করা হ'ত। উবায়দীয় সংস্কৃতি হযরত নূহ্ (দঃ) এর প্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে প্রাচীন বর্ণনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এরূপ প্লাবনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যায়। উবায়দ অঞ্চলে প্রথমে সুমেরীয়গণ, তারপর সিরিয়া ও আরব থেকে যাযাবর সম্প্রদায় এবং শেষে পূর্বাঞ্চল থেকে আগত তৃতীয় এক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে বিখ্যাত সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতারূপে গণ্য করা হয়। এ সভ্যতায় খুব সম্ভবত সর্বপ্রথম বর্ণমালার জন্ম হয়। এই কীলকাকার (cuneiform) বর্ণমালা কাদামাটির বোর্ডে খোদাই করে লেখা হ'ত। আনুমানিক ৩৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বর্ণমালার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কাজে এই লিপি ব্যবহৃত হ'ত। পরবর্তী কালে (খ্রীঃ পূঃ ২৫০০) সুমেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ণনা সংবলিত লিপির প্রচলন হয়। এ সময় সুমেরীয়গণ তাম্র ও ব্রোন্জের ব্যবহারও শুরু করে এবং ব্রোন্জ্ নির্মিত কাস্তের (Sickle) বেশ প্রচলন দেখা যায়। গাধা প্রধান ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হ'ত, কিন্তু প্রায় ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গরু ও লাঙ্গল ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। আরও প্রায় এক হাজার বছর পর যুদ্ধক্ষেত্রে রথ টানার কাজে ঘোড়ার প্রয়োগ শুরু হয়।

www.pathagar.com

আনুমানিক ১৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় গ্লাস নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করা হয় এবং গ্লাসের বোতল প্রস্তুত করার রীতি প্রচলিত হয়।

মেসোপটেমিয়া বেশ কয়েকটি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের (city-state) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কোন সার্বিক বা কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল না। অবশ্য পানি ব্যবহার ও বণ্টনের জন্য বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হ'ত। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের পরিবর্তনশীল পানির পরিমাণের সাথে কৃষিকাজের সমতা রক্ষার জন্য মেসোপটেমিয়ায় এক জটিল ও বিজড়িত সেচখাল ব্যবস্থা গঠন করা হয় এবং এ সকল খালের ব্যবহার ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

পানির নিয়মিত সরবরাহের অভাব ব্যতীত মেসোপটেমিয়ায় কাঠ, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য ও এমন কি প্রস্তরেরও অভাব ছিল। এজন্য প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রকে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ঐ সকল কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হ'ত এবং প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্র কৃষি সম্পর্কিত তৎপরতা ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল।

মেসোপটেমিয়ায় এক সার্বজনীন ধর্ম ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এক সর্বদেবতার মন্দিরের অধীনে প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রের নিজস্ব দেবতা ছিল। নগর রাষ্ট্রের দৈনন্দিন প্রশাসনে ধর্মের কতখানি প্রভাব ছিল, তা সঠিক জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে মেসোপটেমিয়ার নগর-রাষ্ট্রসমূহ মূলত একটি দিব্যতান্ত্রিক (theocratic) পদ্ধতিতে শাসিত হ'ত এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

মেসোপটেমিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক, ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল। এই সভ্যতার প্রথম দিকে কৃষকগণ জমির মালিক ছিল না, রাজা ও যাজক সম্প্রদায় থেকে জমি ভাড়া নেওয়া হ'ত এবং দশ শতাংশ হারে জমির কর ধার্য করা হ'ত। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পর স্বীকৃতি লাভ করে। যাজক সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু জমি ছিল এবং সেই জমিতে ক্রীতদাসের মাধ্যমে কৃষিকাজ করা হ'ত। যুদ্ধবন্দী এবং কর্জ শোধ করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ ক্রীতদাসরূপে কাজ করত। রাজা তাদের খাল খনন, মন্দির বা রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কাজেও নিয়োজিত করতেন।

www.pathagar.com

মেসোপটেমিয়ার প্রায় সবাই কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ করে থাকত। প্রথমে শস্য বিনিময় মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হ'ত। পরে তাম্র, স্বর্ণ, ও রৌপ্য বিনিময় মাধ্যমে পরিণত হয়। সকল বাণিজ্যিক লেনদেনের বিস্তারিত হিসাব রাখা হ'ত এবং সম্ভবত এর ফলস্বরূপ মেসোপটেমিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের গণিতশাস্ত্রের জন্ম হয়। তারা একপ্রকার চান্দ্র (lunar) ক্যালেণ্ডারও প্রণয়ন করে। সমাজে লেখা এবং হিসাবরক্ষণ কাজের জন্য পেশাদার লেখকদের (scribe) নিয়োগ করা হ'ত। তবে যাজক সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিল এবং এ সম্প্রদায়ের লোক বিচারক, উকিল ও ডাক্তারের কাজ করতেন।

মেসোপটেমীয় নগর-রাষ্ট্রসমূহ পানি ও ভূমি ব্যবহার প্রশ্নে প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত হ'ত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সকল নগর রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। ব্যবসা-বাণিজের প্রয়োজনে গোটা অঞ্চলে ও অঞ্চলের বাইরেও যাতায়াত একটি নিয়মিত ঘটনা ছিল এবং বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র হ'তে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি প্রায় ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ইরান, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, ভূমধ্য সাগরীয় উপকূল ও গ্রীস মিশর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

নীল উপত্যকা

মিশরের নীলনদকে ভিত্তি করে প্রাচীনকালে অপর এক নদীমাতৃক সভ্যতার জন্ম হয়। নব্য প্রস্তর যুগের প্রারম্ভে নীলনদের উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট গ্রামীণ জনপদ গড়ে উঠে। এই গ্রামের জনসাধারণ সংলগ্ন ভূমিকে ক্রমশ এক বিস্তৃত কৃষিজমিতে পরিণত করে। প্রস্তর, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের চর্চা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তার সাথে গ্রামসমূহের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নীলনদ উপত্যকায় দু'টি মিশরীয় রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায় এবং সম্ভবত দক্ষিণ রাজ্যটির সাথে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। নীলনদ সভ্যতার অন্যতম প্রধান অবদান এক বিশেষ ধরনের বর্ণমালা—যা প্রকৃতপক্ষে একটি চিত্রলিপি

www.pathagar.com

(hieroglyph) । এই বর্ণমালার লিপি দেয়ালে, শিলাখণ্ডে এবং নীল নদে প্রাপ্ত প্যাপাইরাস (papyrus) দ্বারা তৈরী কাগজে পাওয়া গিয়েছে। অনেক মনে করেন যে, মিশরীয়গণ বর্ণমালার ধারণা মেসোপটেমিয়া থেকে লাভ করেছিল এবং পরে সেই ধারণা থেকে স্বকীয় চিত্রলিপি উদ্ভাবিত করে।

মেসোপটেমিয়ার ন্যায় মিশরেও কৃষিকাজের জন্য সেচের প্রয়োজন ছিল। বৃষ্টির অপ্রতুলতার জন্য মিশর পানির জন্য সম্পূর্ণরূপে নীলনদের উপর নির্ভর করত। আদিকালে মিশরীয়গণ নীলনদের পানি থেকে প্লাবন সেচের মাধ্যমে কৃষিকাজ করত, কিন্তু পরে খাল খননের মাধ্যমে এক বিস্তৃত সেচ ব্যবস্থার জন্ম হয়।

আনুমানিক ২৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ মিশরের রাজা মেনেস (Menes) দক্ষিণ ও উত্তর মিশরকে একীভূত করে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিশরে তখন এক নতুন রাজবংশীয় যুগের সূচনা হয়। মিশরের দুই অংশের ঐক্য সাধনের পর রাজা সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। নীলনদ সভ্যতায় মেসোপটেমিয়ার ন্যায় নগরায়নের ব্যাপকতা ছিল না। নীলনদের দু'পাশে অবস্থিত অসংখ্য কৃষিগ্রামসমূহ এই সভ্যতার মূল ও প্রকৃত পরিচয় বহন করে। কোন কোন গ্রামে অবশ্য বিশেষ কারিগরি পেশার প্রাধান্য ছিল। রাজবংশীয় যুগে সকল কৃষককে ক্রীতদাসের ন্যায় দায়বদ্ধ কৃষক (serf) রূপে গণ্য করা হ'ত। রাজার আদেশে তারা কৃষি বা অন্য যে কোন কাজ করতে বাধ্য ছিল। রাজার মূল দপ্তর প্রধান শহরের মত ভূমিকা পালন করত; এ ছাড়া অপর কোন উল্লেখযোগ্য নগরীয় বসতির অস্তিত্ব ছিল না। নীলনদ সভ্যতা মূলত একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ছিল; সেখানে বাণিজ্যিক তৎপরতার তেমন কোন প্রাধান্য ছিল না। রাজ্যের অধিকাংশ জনসাধারণ ভূমিতে কর্মরত থাকত এবং মেসোপটেমিয়ার ন্যায় সেখানে কোন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেনি।

রাজা নিজেকে দেবতুল্যরূপে অভিহিত করতেন। তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী, বিচারক, ব্যবসায়ী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত অসীম ও অভ্রান্ত মনে করা হ'ত, অর্থাৎ রাজা রাজ্যের সকল ব্যাপারে সর্বশক্তিমান ছিলেন। রাজ্যের যাজক সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট

www.pathagar.com

প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু তাঁরাও রাজার অধীন ছিলেন। সর্বক্ষেত্রে রাজার ঐশ্বরিক রূপ ও একাধিপত্যের ফলে নীলনদের সকল শিল্পকলা ও স্মৃতিরক্ষাকারী স্থাপত্যশিল্পে ঐ ধ্যানধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর পরলোক সম্পর্কে তারা বেশ চিন্তাভাবনা করত বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে রাজাদের জন্য নির্মিত পিরামিড সমাধিসৌধ এবং তার অভ্যন্তরে বিস্তারিত সাজসরঞ্জাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কঠিন শিলাখণ্ড দ্বারা নির্মিত এসকল স্মৃতিসৌধ যুগ যুগ ধরে মানুষের বিস্ময় সঞ্চার করেছে। অবশ্য মিশরের সাধারণ মানুষের গৃহ অত্যন্ত নগণ্য ধরনের ছিল; রোদে-পোড়া ইট দিয়ে প্রধানত গ্রামের সাধারণ ঘরবাড়ী নির্মিত হ'ত। এ যুগের চিত্রকলা, শিলালিপি এবং সমাধিস্থলে সঞ্চিত লিখিত তথ্য ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের দ্রব্যাদি বিশ্লেষণ করে নীলনদ সভ্যতার এক বিস্তারিত চিত্র প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উদ্‌ঘাটন করেছেন। নীলনদ ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতাদ্বয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাদৃশ্য দেখা গেলেও বস্তুতপক্ষে এই দুই সভ্যতার সংগঠন ও মৌলিক কাঠামো ভিন্নতর ছিল।

সিন্ধু উপত্যকা

প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার তৃতীয় প্রধান কেন্দ্র পাকিস্তানের সিন্ধু নদ উপত্যকা। সিন্ধু নদের তীরে আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় যে ঐ অঞ্চলে প্রায় ৫০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এক উন্নতমানের সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। এ সভ্যতা প্রধানত নগরীয় সভ্যতা ছিল, কিন্তু সমকালীন গ্রামীন জনপদসমূহ ঐ অঞ্চলে কিভাবে নগরীয় জনপদে রূপান্তরিত হ'ল তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে সিন্ধু সভ্যতার দু'টি প্রধান নগরীয় কেন্দ্র ছিল—৩৫০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা। মহেঞ্জোদারো শহরটি সিন্ধু মরুভূমিতে ৫০ ফুট বালির নীচে আবিষ্কৃত হয়েছে। উভয় শহরই পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় এবং আয়তাকার (rectangular) রাস্তা-প্যাটার্ন উভয় শহরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শহরের প্রতিটি রাস্তা বেশ প্রশস্ত এবং এক রাস্তা অপর রাস্তাকে সমকোণে অতিক্রম করায় গোটা নগরীয় এলাকা বেশ কয়েকটি বর্গাকৃতি বা চৌকো

www.pathagar.com

আবাসিক ব্লকে বিভক্ত হয়। কোন বাড়ী দোতলা ছিল এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে স্নানাগার ও আবর্জনা নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এ সকল বাড়ীতে খুব সম্ভবত শাসক বা উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। শহরের অন্যত্র সাধারণ মানুষের জন্য যে সকল গৃহ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অনাকর্ষণীয়। উভয় শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটি নগরদুর্গ (citadel) নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃত ব্যবহার কি ছিল সে সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়নি। দু'টি শহরেই বিরাট শস্যাগারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকগণ তাম্র ও ব্রোন্‌জ্‌ ব্যবহার, আগুনে ইট পোড়ানো, বর্ণমালা বা লিপি এবং পানি সেচের কৌশল সম্পর্কে অবগত ছিল বলে মনে হয়। নীলনদের ন্যায় সিন্ধু নদে বর্ষার পানি বাড়লে খাল কেটে সেই পানি উর্বর জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ত। ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত খোদাইকৃত সীলমোহর থেকে সিন্ধু সভ্যতায় গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল ও হাতীর ব্যবহার সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার ন্যায় সিন্ধু সভ্যতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল। সেখানে ব্যবহৃত সকল প্রকার প্রস্তর ও নির্মাণসামগ্রী বাইরে থেকে আমদানী করতে হ'ত। প্রায় ২৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময়কালে সিন্ধু সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় খননকাজের মাধ্যমে মেসোপটেমিয়ায় নির্মিত আগুনে পোড়ানো কাদামাটির মূর্তি (terra colta) আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতায় এক প্রকার বর্ণমালার প্রচলন ছিল, কিন্তু এখনো তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে তাদের বর্ণমালা পরবর্তীকালে এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।

নীলনদ ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার মত সিন্ধু নদ সভ্যতার কোন বৃহদাকার অট্টালিকা বা মন্দির আবিষ্কৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বা প্রথা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি, ক্ষুদ্র কাদামাটির মূর্তি, সীলমোহর, মন্ত্রপূত কবচ (amulet) এবং লিঙ্গমূর্তি সংক্রান্ত চিহ্ন পরীক্ষা করে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে পরবর্তীকালের ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের আদিরূপ সিন্ধু সভ্যতায় অঙ্কুরিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্য সম্প্রদায় সিন্ধু অববাহিকায় এসে পৌঁছায় এবং তাদের ধ্বংসলীলার ফলে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে।

উত্তর চীন

সিন্ধু সভ্যতার পতনের যুগে অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উত্তর চীনের হোয়াং হো নদীর অববাহিকায় অপর এক নদীমাতৃক সভ্যতার সূচনা হয়। মেসোপটেমীয় ও সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ উত্তর চীন বা হোয়াং হো সভ্যতায় বড় বড় নগরীয় জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চীনে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালানো সত্ত্বেও প্রাচীন চীনা সংস্কৃতি সম্বন্ধে এখনো অনেক তথ্য জানা বাকী আছে।

চীনে নব্য প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির আদি নিদর্শন পাওয়া যায় শাং (Shang) রাজবংশের শাসনকালে (খ্রীঃ পূঃ ১৭৬৬—১১২৩)। শাং রাজ্য হোয়াং হো নদী উপত্যকায় অবস্থিত ছিল এবং শাং জাতি একটি সমৃদ্ধিশালী কৃষি-ভিত্তিক সম্প্রদায় ছিল বলে অনুমান করা হয়। শাংদের উৎকৃষ্ট ব্রোন্জ্ সংস্কৃতির স্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমানকালে চীনের ঐ অঞ্চলে ব্যবহৃত ব্রোন্জ্ পাত্রাদিতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শাং রাজ্য চৌ রাজবংশ কর্তৃক বিজিত হয় এবং দু'টি সংস্কৃতি অতি দ্রুত একীভূত হয়। চৌ বংশের সংস্কৃতিতে আরও উন্নততর ব্রোন্জ্ ব্যবহার দেখা যায়। শাং ও চৌদের দ্বারা নির্মিত ব্রোন্জের বিভিন্ন বস্তুতে খচিত করা প্রাচীন চীনা লিপির নমুনা পাওয়া যায়। এ সকল লিপি ছাড়াও চীনা সংস্কৃতি সম্বন্ধে আরও অন্যান্য লিপি (যুগ যুগ ধরে চীনা লেখকগণ যার প্রতিলিপি তৈরী করে গেছেন) থেকে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

চৌ রাজবংশের স্থিতিকাল ২১৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। এ সময়কালের চীনা সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং কোন কোন চীনা লেখক একে "ক্রীতদাস সমাজ"ও বলেছেন। শাং ও চৌ উভয় সময়কালে সবাই ছোট ছোট গ্রামে বাস করত এবং গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণতঃ একই জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত হ'ত। এ সকল কৃষিজীবী মানুষ তৎকালীন সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের সদস্য ছিল বলে

www.pathagar.com

মনে হয়। তাদের উপর ছিল বাংশানুক্রমিক অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজা ছিলেন সবার উপরে। যুদ্ধবন্দীদের সাধারণতঃ ক্রীতদাসরূপে কৃষিকাজে বা কারিগরি শিল্পে নিয়োজিত করা হ'ত। কৃষকগণ পরিবার বা গোষ্ঠীগত ভাবে জমির মালিকানা পেত এবং পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট জমিগুলি সবাই চাষ করত। জমির জন্য কৃষকগণ তাদের জমিদার এবং জমিদারগণ রাজার নিকট আনুক্রমিকভাবে দায়ী থাকত।

শাং ও চৌ সময়কালে বেশ কয়েকটি শহর ও নগরও প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরীয় জনপদসমূহ অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাস এবং শস্য সংরক্ষণ, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। এ ছাড়া সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী কারিগর ও প্রশাসনিক লোকও বাস করত।

প্রাচীন চীনে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কোন কোন ধনী লোকের সমাধিতে প্রচুর ধনদৌলত মৃতদেহের সাথে সমাহিত করার প্রথা ছিল। চীনা লিপিতে এরূপ সমাধিস্থ করার বিস্তারিত বিবরণ প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। চীনে পরবর্তীকালে পিতৃপুরুষ উপাসনার যে প্রথা প্রচলিত হয়, তার ভিত্তি সম্ভবত শাং ও চৌ সময়কালেই স্থাপিত হয়েছিল।

উত্তর চীনের হোয়াং হো সভ্যতা তার উৎসস্থল থেকে চতুর্দিকে বেশ ব্যাপকভাবে প্রসারণ লাভ করে। পশ্চিমে মধ্য এশিয়া হ'তে পূর্বে জাপান এবং দক্ষিণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এ সভ্যতার প্রভাব অনুভূত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে আলোচিত চারটি প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতাকেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র হোয়াং হো কেন্দ্রই বহু সহস্র বছর ধরে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত ও বিবর্ধিত হয়েছে। অপর তিনটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিভিন্ন সময় লুপ্ত বা নির্বাপিত হয়ে যায়।

আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা

প্রায় ৩০,০০০ বছর বা তারও পূর্বে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে প্রথম মানবগোষ্ঠী এশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করে। এ সকল মানুষ সম্ভবত প্রস্তর যুগের শিকারী ও সংগ্রাহক (collector) ছিল এবং ক্রমশ স্থানীয় পরিবেশের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে তারা স্বকীয় জীবনধারা রচনা করে। আমেরিকায় দু'টি সভ্যতাকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র—১১)। এদের

www.pathagar.com

মধ্যে একটি মধ্য আমেরিকা (মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, বেলিস ও এল মালভাদোর) এবং অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য-আন্দিজ অঞ্চল (পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্যাঞ্চল এবং সংলগ্ন উপকূলীয় সমভূমি)। এ দু'টি কেন্দ্রে সভ্যতা স্বাধীনভাবে বিকশিত হ'লেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়।

মধ্য আমেরিকা : প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক ৭০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীরা কিছু কিছু শস্য, যেমন কুমড়া, লঙ্কা ইত্যাদি উৎপাদন করা শুরু করেছিল। এর পর তারা একজাতীয় শিম-ভুট্টা ও তুলার চাষ শুরু করে। তবে এখানে গ্রামীণ বসতির জন্ম এশিয়ার তুলনায় তত প্রাচীনকালে হয়নি। সম্ভবত ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বে মধ্য আমেরিকায় গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জনপদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য বেশ বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হয়। প্রায় ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময়কালে মধ্য আমেরিকায় নগরীয় জনপদ গড়ে উঠে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর —তেওতি হুয়াকান (Teotihuacan)—বর্তমান মেক্সিকো শহরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার জনসংখ্যা এক লক্ষের অধিক ছিল বলে অনুমান করা হয়। স্প্যানীশগণ যখন ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে মেক্সিকোর উঁচু সমভূমিতে পৌঁছায় তখন সেখানে আজ্‌টেক্ (Aztec) সম্প্রদায় এক সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ করছিল।

মেক্সিকোর ইউকাতান (Yucatan) নিম্নভূমি ও সংলগ্ন গুয়াতেমালার নিম্নভূমিতে মায়া (Maya) সম্প্রদায় এক বিস্তৃত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মায়া সভ্যতা তার শীর্ষে পৌঁছায়। মায়াগণ কৃষিজীবী ছিল এবং তারা চুনাপাথরের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অট্টালিকা নির্মাণ করে। কিন্তু মায়া সম্প্রদায়ের নগরীয় জীবনের তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মায়া সভ্যতার অন্যতম অবদান এক জটিল ক্যালেণ্ডার এবং চিত্রলিপিক বর্ণমালা। তাছাড়া মায়াগণ গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, মৃৎশিল্প ও ভাস্কার্য-বিদ্যায় কিছুটা অগ্রগতি সাধন করে। কিন্তু মধ্য আমেরিকায় প্রাক-ইউরোপীয় যুগে চাকার ব্যবহার জানা ছিল না।

www.pathagar.com

মধ্য-আন্দিজ অঞ্চল : পেরুর আন্দিজ পার্বত্যাঞ্চলে খননকার্যের দ্বারা প্রায় ৪৫০০ বছরের পুরাতন গ্রামীণ জনপদ আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দেও সেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করত। ইন্‌কা (Inca) সংস্কৃতি আন্দিজ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সভ্যতা। প্রাচীনকালের আন্দিজ অধিবাসিগণ হয়ত শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত, কিন্তু তার সাথে ভুট্টা, কুমড়া, শিম, কোকো, তামাক ও তুলা চাষের প্রচলনও ছিল। পরবর্তীকালে ক্যাসাভা, মিষ্টি আলু এবং চীনাবাদামের উৎপাদন শুরু হয়। আন্দিজ অঞ্চলে মাত্র নবম শতাব্দীতে প্রথম নগরীয় জনপদের জন্ম হয় এবং ইন্‌কাগণ পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়ে এক বিস্তারিত সড়ক ব্যবস্থা নির্মাণ করে এবং রানার (runner) দ্বারা সংবাদ প্রেরণের রীতি প্রবর্তন করে। ইন্‌কাগণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোন্‌জের পাত্রাদি নির্মাণ করত এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তুলা ও আলপাকার উল দ্বারা তৈরী করা হ'ত। ইন্‌কা সভ্যতায় মধ্য আমেরিকা অপেক্ষা পশুপালনের অধিকতর প্রচলন ছিল। বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়ে ইন্‌কাগণ বহু অট্টালিকা ও ঘরবাড়ী নির্মাণ করেছে এবং এদের ধ্বংসাবশেষ এখনো পেরুতে দেখা যায়।

আন্দিজ অঞ্চলে কোন বর্ণমালার প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং বর্ণমালার অভাবে হয়ত সেখানে গণিত, জ্যোতিঃশাস্ত্র বা ক্যালেণ্ডার সৃষ্টির চর্চা হয়নি। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দিজ অঞ্চলে ইন্‌কা সভ্যতার এক বিরাট সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ; ঐ সময় স্প্যানীশগণ আমেরিকায় আগমনের পর ইন্‌কা সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নগরবিপ্লব ও নগরায়ন

নগরীয় জনপদ মানবসভ্যতার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি। কৃষি উদ্ভবের পর মানুষ যেমন স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে, তেমনি তার পরবর্তী পর্যায়ে যখন অ-কৃষি জনপদ গড়ে উঠে, তাকে সাধারণতঃ নগরবিপ্লব (urban revolution) নামে আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিম এশিয়ায় আনুমানিক ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম নগরীয় জনপদের সৃষ্টি হয়। নব্য প্রস্তর যুগের শেষার্ধে লাঙ্গল আবিষ্কারের পর যখন প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হ'ল, তখন সমাজের কোন কোন সম্প্রদায় অ-কৃষিকাজে

www.pathagar.com

নিজকে নিয়োজিত করে এবং এর ফলস্বরূপ তারা নগরীয় বসতি প্রতিষ্ঠিত করে। প্রায় ৩৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পর মেসোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় কিছু কিছু বসতি গড়ে উঠে যার অধিবাসিগণ খাদ্য উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য কর্মকাণ্ড, যেমন কারিগরি শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিল। এ সকল অ-কৃষি তৎপরতা নগর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে এবং সাধারণতঃ আদি নগরসমূহ নদীর ধারে এবং অন্যান্য অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে উঠে। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে স্থাপিত পৃথিবীর প্রাচীনতম উল্লেখযোগ্য নগরীয় জনপদগুলি হচ্ছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় উর (Ur), নিপ্পুর (Nippur), কিশ (Kish), এরেক (Erech), লাগাশ (Lagash), ব্যাবিলন (Babylon), আসুর (Assur), ও নিনেভেহ্ (Nineveh); মিশরে থিবিস, (Thebes) ও মেম্ফিস্ (Memphis); এবং সিন্ধু উপত্যকায় হারাপ্পা (Harappa) ও মহেঞ্জোদারো (Mohenjodaro)। এদের মধ্যে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের বদ্বীপে অবস্থিত মেসোপটেমীয় শহর উর, এরেক ও লাগাশ সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরীয় জনপদ। মেসোপটেমীয় শহরগুলিতে বিভিন্ন পেশার লোক বাস করত এবং শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র এলাকা গড়ে উঠেছিল, যেমন প্রায় প্রত্যেক শহরে উপাসনা, শস্য সংরক্ষণ, কারিগরি শিল্প ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন তৎপরতার জন্য পৃথক এলাকা নির্দেশিত ছিল।

পশ্চিম এশিয়া থেকে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে নগরবিপ্লব ক্রমশ ফিনিশিয়া (Phoenicia), এশিয়া মাইনর ও ক্রীটে প্রসারণ লাভ করে। ব্রোন্জ্ যুগে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে বিব্লস্ (Byblos), উগারিত (Ugarit), টায়ার (Tyre) ও সিডন (Sidon) এবং ক্রীট দ্বীপে ফাইস্টোস (Phaistos) ও নসস্ (Knossos) ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক নগর স্থাপিত হয়। এর কিছুকাল পর স্থলপথে বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে সিরিয়ার মরুদ্যানসমূহে শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দূরে, উত্তর চীনেও তখন পশ্চিম এশিয়ার নদীমাতৃক নগরীয় জনপদের ন্যায় শহর গড়ে উঠে এবং সেখান থেকে নগর বিপ্লব চীনের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে।

পশ্চিম এশিয়ায় সূচিত নগর প্রতিষ্ঠার ধারা গ্রীস ও ইটালী হয়ে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সঞ্চারিত হয়। অনুরূপভাবে,

www.pathagar.com

এই ধারা পারস্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হয় এবং নগরায়ন প্রক্রিয়া তৎকালীন সকল সভ্যতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় প্রাপ্ত আয়তাকার নক্সার ভিত্তিতে গঠিত নগরীয় জনপদ স্পেন থেকে চীনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল। এ সময় লোহার ব্যবহারও শুরু হয় এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ সঠিকভাবে নগরায়নে সহায়তা করে। কিন্তু ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা হওয়ার পর নগরায়ন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। বস্তুত-পক্ষে, একাদশ শতাব্দীর পর ইউরোপে আবার নগরজীবন গুরুত্ব লাভ করে এবং বাণিজ্যিক প্রসার নগরায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। মধ্য-যুগের ইউরোপীয় নগরসমূহ সাধারণতঃ প্রাচীর বেষ্টিত হ'ত, কারণ ঐ সময় বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা নগরবাসীর অন্যতম সমস্যা ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে প্রায় শতাধিক শহর গড়ে উঠে। ইউরোপের বাইরে ঐ সময়কালে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অঞ্চলেও নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত প্রসার লাভ করে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি নগরীয় জনপদের জন্ম হয়। আবার অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে ঐ অঞ্চলে নগরায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

আমেরিকায় পশ্চিম এশিয়ার ন্যায় নগরবিপ্লবের কোন প্রাচীন ইতিহাস নেই। তবে, অনুমান করা হয় যে খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্র বছরে মায়া ও অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মধ্য আমেরিকায় কয়েকটি শহর স্থাপন করে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেক্সিকোর তেওতিহুয়াকান। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপীয়দের আগমনের পরই আমেরিকায় নগরীয় জীবনের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিক যুগে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে নগরায়ন প্রক্রিয়া এক অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করে এবং পৃথিবীর সকল দেশ বর্তমানে এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে পুরাতন শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং নতুন নগরীয় জনপদ সৃষ্টি হচ্ছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয়প্রকার দেশেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে (Secondary and tertiary) কর্মরত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং তার ফলে নগরায়ন আজ এক বিশ্বজনীন ঘটনা।

www.pathagar.com

শিল্পবিপ্লব

প্রাচীন যুগের তথাকথিত কৃষিবিপ্লবের ন্যায় আধুনিক কালের শিল্পবিপ্লব মানব-ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে নানা ধরনের গবেষণা চালানো হয়। এই সময়কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন ও আবিষ্কার সম্ভব হয়, তাকে সাধারণভাবে শিল্পবিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। এই বৈপ্লবিক ঘটনার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে: হাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির পরিবর্তে মেসিনের প্রবর্তন; নতুন প্রাইমমুভার (prime mover) আবিষ্কার; এবং ফ্যাক্টরী বা কারখানা ভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের প্রচলন। অবশ্য নিঃসন্দেহে শিল্পবিপ্লবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার, যা উপরে নতুন প্রাইমমুভাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে প্রায় সমান গুরুত্বের দাবী রাখে লৌহ গলানোর জন্য কোক্ (coke) বা পোড়া পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহারের উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। স্কটল্যাণ্ডের জেম্‌স্ ওয়াট্ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন—তিনি ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে হেনরী কোর্ট্ আবিষ্কার করেন যে, লৌহ গলানোর কাজে কাঠ কয়লার পরিবর্তে কোক্ ব্যবহার অধিকতর সুবিধাজনক।

উপরোক্ত দু'টি উদ্ভাবনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোক্ ব্যবহারের সুবিধা আবিষ্কৃত হওয়ায় শিল্প উৎপাদনে বনজ সম্পদের উপর আর নির্ভর করতে হ'ল না এবং ব্রিটেনের চারিটি প্রধান কয়লা-খনি অঞ্চলে সকল কল-কারখানা কেন্দ্রীভূত হ'ল। অনুরূপভাবে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে খরস্রোতা নদীর উপকূলে কল-কারখানা-সমূহ স্থাপিত না হয়ে প্রধান প্রধান কয়লা খনির নিকটে গড়ে উঠল। এরূপ কেন্দ্রীভবন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এক সার্বিক সমৃদ্ধি এনে দেয় এবং শিল্প তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ব্রিটেনের সকল স্তরে পরিলক্ষিত হয়; যন্ত্রপাতি বা জাহাজ নির্মাণ, বয়ন-শিল্প বা কৃষিকাজ—সকল কর্মকাণ্ডে এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা হয়।

শিল্পবিপ্লব কেবলমাত্র বড় বড় যন্ত্রপাতি নির্মাণে সুবিধা এনে দেয়নি। এই বিপ্লবের ফলে বড় যন্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

প্রসার লাভ করে। এ সকল মেশিন তৈরীর জন্য যন্ত্রপাতি (machine tools) সম্বন্ধে ১৭৭৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটেনে প্রচুর মৌলিক গবেষণা করা হয়েছে। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

কৃষিকাজেও শিল্পবিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একথা সত্য যে, শহরে কলকারখানা গড়ে উঠার ফলে পল্লীঅঞ্চল থেকে শহরে মানুষ চলে আসতে শুরু করে; কিন্তু পল্লীঅঞ্চলে অন্য একটি বিকর্ষণী শক্তিরও জন্ম হয়, কারণ কৃষিকাজে নতুন ও কর্মক্ষম যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষিজমিতে শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে এবং তারা তখন নগরমুখী হয়। মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালের মধ্যে হাতে নির্মিত কাঠের কৃষি যন্ত্রপাতির পরিবর্তে ফ্যাক্টরীতে নির্মিত লৌহ ও ইস্পাতের যন্ত্রাদি ব্যবহারের প্রচলন হয়। উল্লেখ্য যে, শস্য উৎপাদনের সকল স্তরে, যেমন, কৃষিজমির প্রস্তুতি, বীজ বপন, আগাছা পরিষ্কার করা, শস্য কাটা বা শস্য-মাড়াই ইত্যাদি কাজে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় যন্ত্রাদি ব্যবহার শুরু হয়। এ সকল যান্ত্রিকীকরণের সুবিধাদি সার্বিক শস্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়।

শিল্পবিপ্লব ব্রিটেনে অঙ্কুরিত হওয়ার পর ইউরোপের অন্যান্য দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বল্পদিনের মধ্যে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চরম শিখরে পৌঁছায়। শিল্পবিপ্লব মানবসমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব এনে দেয়। সারা বিশ্বে নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং মানব ইতিহাসের প্রাযুক্তিক উন্নয়নধারা তার চরম-সীমার দিকে অগ্রসর হয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ঃ বর্ণ (রেস্)

মানবজাতি একটি একক প্রজাতি (species), কিন্তু তার মধ্যে বিবিধ প্রকারের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা দেখা যায়। এর ফলে মানবজাতিকে কতিপয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে—যা বংশানুক্রমে পরিবাহিত হয়—বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীতে (racial groups) বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল বর্ণগোষ্ঠী প্রধানত সমরূপী, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে, তার উৎপত্তি ও ভৌগোলিক বিস্তারণের কারণ প্রজননশাস্ত্র করতে পারে। প্রজননবিদদের মতে মানুষ তার পিতামাতার নিকট থেকে বংশানুসরণে গায়ের রং, চুলের প্রকৃতি, নাসিকার আকার ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে থাকে। বংশানুসরণের এই বাহকের নাম জীন্ (gene) এবং মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর উৎপত্তিতে এই জীনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণ বা "রেস্" (race) শব্দটি প্রধানত মানবজাতির শারীরিক বিভিন্নতার সাথে সম্পর্কিত হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শব্দ ব্যবহারে নানাপ্রকার অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে 'বর্ণ' শব্দটি আবেগপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে এর প্রকৃত মর্মার্থ প্রকাশ পায় না। আধুনিক জগতে মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর পার্থক্যকে ভিত্তি করে বর্ণবৈষম্য দেখা যায়, যার পরিণামে সর্বজনধিকৃত বর্ণবাদের (racism) জন্ম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বর্ণগোষ্ঠীসমূহকে বহু ক্ষেত্রে মানবজাতির কয়েকটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল গোত্ররূপে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন পরস্পর সংযোগবিহীন ও তথাকথিত "বিশুদ্ধ" বর্ণ পাওয়া যাবে না।

বর্ণ শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা ও নীতি

মানবজাতিকে বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভক্ত করা একটি জটিল সমস্যা। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেই বিভক্ত নয়, বরং তাদের রক্ত নমুনাও (blood type) বিভিন্নতর। জীনের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন প্রলক্ষণ (trait) নির্দেশিত হয়, কিন্তু কোন কোন জীনের উপস্থিতি কোন

www.pathagar.com

মানবগোষ্ঠীতে কম বা বেশী হতে পারে। অনুরূপ জীন্-প্যাটার্নে প্রতিটি বর্ণগোষ্ঠীর জন্ম। তবে বিভিন্ন প্রলক্ষণের জীন্ উৎপত্তি সম্পর্কে অতি সামান্যই বর্তমানে জানা যায়, তাই প্রলক্ষণসমূহের উপর ভিত্তি করেই মানবজাতিকে বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নয়; কারণ বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর প্রলক্ষণ বৈচিত্র্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। যেমন, গায়ের রং এর উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে যে কয়েকটি বর্ণগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়, তার সাথে চুলের ভিত্তিতে শ্রেণীভুক্ত বর্ণগোষ্ঠীর কোন সমন্বয় পাওয়া যায় না।

মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর বিবরণ দেওয়ার পূর্বে শ্রেণীবিভাজনের বিভিন্ন ভিত্তি বা মাপকাঠির আলোচনা করা প্রয়োজন। দৈহিক উচ্চতা মানুষের অন্যতম শারীরিক প্রলক্ষণ যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য দেখা যায় যে এই প্রলক্ষণের ভিত্তিতে সঠিক বর্ণগোষ্ঠী নিরূপণ সম্ভব নয়। পুরুষ মানুষের গড় উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। কিন্তু ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চতার মানুষ সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। আফ্রিকার পিগমি সম্প্রদায় ক্ষুদ্রকায় মানুষের নিদর্শন; আবার আফ্রিকা মহাদেশে সুদানের ডিন্কা উপজাতি পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘকায় মানবগোষ্ঠী। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, খাদ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসার উন্নতির ফলে সাধারণতঃ মানুষের উচ্চতা কিছুটা বাড়ে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী দৈহিক উচ্চতার ব্যাপক বিভিন্নতার দরুন মানবজাতির শ্রেণীবিভাজনে এই প্রলক্ষণ বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়।

মস্তিকের আকৃতি এককালে বর্ণগোষ্ঠীর সর্বোত্তম চিহ্নরূপে পরিগণিত হ'ত। কিন্তু বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে মস্তিষ্ক আকৃতির নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি সূচকের মাধ্যমে মস্তিষ্ক আকৃতিকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এই মস্তিষ্ক সূচক হ'ল :

$$\frac{\text{মস্তিষ্ক প্রস্থ}}{\text{মস্তিষ্ক দৈর্ঘ্য}} \times ১০০$$

এই সূচক ৭৫ এর নিম্নে হলে লম্বা-মাথা, ৭৫ হতে ৮০ মাঝারি-মাথা এবং ৮০ এর উর্ধে চওড়া-মাথা নির্দেশ করে। তবে সাধারণভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন

www.pathagar.com

বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মস্তিষ্ক সূচকে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। শ্বেতকায় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে রুশদের মস্তিষ্ক চওড়া, কিন্তু নরওয়েজীয়দের মস্তিষ্ক লম্বা। অপরদিকে মঙ্গোলীয়দের মস্তিষ্ক সাধারণতঃ চওড়া, কিন্তু অধিকাংশ জাপানীর মস্তিষ্ক লম্বা। আবার কৃষ্ণকায় নিগ্রো এবং শ্বেতকায় পশ্চিম ইউরোপীয়—উভয়ের মস্তিষ্কই লম্বা। এসকল বিভিন্নতার জন্য মস্তিষ্ক আকৃতিকে বর্ণগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজনে একক ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

মস্তিষ্ক আকৃতির ন্যায় নাকের আকৃতির উপর ভিত্তি করেও মানবজাতির শ্রেণীবিভাজনের চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণতঃ, আফ্রিকানদের নাক চওড়া ও চ্যাপ্‌টা এবং উত্তর ইউরোপীয়দের নাক সরু হয়ে থাকে। আবার ইহুদী ও অন্যান্য সেমিটিক জাতীয় মানুষের নাক লম্বা এবং কিছুটা হুকের ন্যায় বক্র দেখা যায়। নাকের আকৃতির সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক আছে কি না সে সম্বন্ধে সবাই একমত নন, তবে নাকের রূপ ও আকৃতি প্রধানত বংশানুক্রমিক জীনের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে মনে হয়। নাকের মত মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ঠোঁটের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের ঠোঁট প্রধানত মোটা এবং উল্‌টানো হয়, কিন্তু অন্যান্য বর্ণগোষ্ঠীতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

বর্ণগোষ্ঠী নির্ণয়ে অপর এক বিশিষ্ট প্রলক্ষণ হচ্ছে চুলের গঠন। প্রকৃতপক্ষে চুলের গঠনে সোজা থেকে পশমতুল্য ও কুঞ্চিত ইত্যাদি বিবিধ ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মঙ্গোলীয় জাতির চুল সাধারণতঃ সোজা এবং ককেশীয়দের চুল ঢেউ-খেলানো অথবা কোঁকড়া গঠনের হয়। কিন্তু নিগ্রোদের চুল পশম-তুল্য ও কুঞ্চিত ধরনের হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, চুলের গঠন বংশানুক্রমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। চুলের গঠনের ন্যায় চুলের রং এ ততটা বৈসাদৃশ্য দেখা যায় না। মানবজাতির অধিকাংশ সদস্যের চুল কাল বা গাঢ় বাদামী। কেবল-মাত্র ইউরোপীয়দের মধ্যে চুলের রং বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। তাদের চুল কাল, গাঢ় বাদামী, হালকা বাদামী, লাল এবং সোনালী রং-এর হয়ে থাকে।

চোখের আকৃতি বর্ণগোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রলক্ষণ। পীতবর্ণের মঙ্গোলীয় জাতিতে এক বিশেষ ধরনের চোখ দেখা যায়, যা সাধারণতঃ মঙ্গোলীয় চোখ নামে পরিচিত। এই চোখের বিশেষত্ব হচ্ছে যে চোখ খোলা অবস্থায় থাকলেও চোখের উপরের পাতা কিছুটা ভাঁজ হয়ে থাকে এবং চোখের কোণা

www.pathagar.com

বাইরে ও উপর দিকে কিছুটা তির্যকভাবে উঠে থাকে। মানবজাতির অন্যান্য বর্ণগোষ্ঠীতে চোখের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। চোখের রং সাধারণতঃ কাল ও বাদামী রং-এর হয়, ইউরোপীয়দের চোখ নীল, হালকা বাদামী ও সবুজও দেখা যায়।

মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীতে রক্ত নমুনার বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। চারটি প্রধান রক্ত গ্রুপ হচ্ছে 'এ', 'বি', 'ও' এবং 'এবি'। 'ও' এবং 'এ' রক্ত নমুনা পশ্চিম ইউরোপে পাওয়া যায় এবং ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের মধ্যেও এই রক্ত নমুনার প্রাধান্য রয়েছে। এশিয়াতে 'ও' রক্তগ্রুপ প্রথম এবং 'এ' ও 'বি' দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে—সেখানে 'এবি' সাধারণতঃ দেখা যায় না। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে 'ও' এবং 'এ' গ্রুপের প্রাধান্য আছে, তবে 'বি' এবং 'এবি' খুব কম দেখা যায়। নিগ্রোদের মধ্যে 'ও' রক্তগ্রুপ সর্বাধিক এবং স্বল্প সংখ্যায় 'এ' ও 'বি' গ্রুপ দেখা যায়। রক্ত নমুনা জীন্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পৃথিবী ব্যাপী রক্ত-নমুনার বিস্তারণ সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্ণগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজনে রক্ত-নমুনা অন্যান্য শারীরিক প্রলক্ষণের সাথে সম্পুরকরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গায়ের রং অনেকের মতে বর্ণগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ প্রলক্ষণ। 'মেলানিন' নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের কারণে চামড়ার রং হালকা তথা শ্বেতকায় অথবা কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে। মেলানিনের পরিমাণ পারিবেশিক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে মেলানিনের পরিমাণ মূলত বংশগত কারণে নির্ধারিত হয়। মানবজাতিকে অনেক ক্ষেত্রেই গায়ের রং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়; কারণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় ও ককেশীয়গণ শ্বেতকায়, নিগ্রোগণ কৃষ্ণাভ এবং মঙ্গোলীয়গণ পীতবর্ণের হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে কেবলমাত্র গায়ের রং-এর ভিত্তিতে বর্ণগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ শ্রেণীবিভাজন প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

প্রধান বর্ণগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক বিস্তারণ

উপরে উল্লিখিত প্রলক্ষণসমূহের ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীতে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যে কোন শ্রেণীভাজন আপাতদৃষ্টিতে

www.pathagar.com

কৃত্রিম ও অবাস্তব মনে হবে। যে সকল নৃতত্ত্ববিদ শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন প্রলক্ষণের উপর বিভিন্নতর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ফলে আধুনিককালে বেশ কয়েকটি শ্রেণীবিভাজন উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানবজাতির মধ্যে কোন বর্ণভিত্তিক বিভিন্নতা নেই। বর্তমানে সাধারণতঃ দুই জাতীয় প্রাকৃতিক প্রলক্ষণ বিচার করে বর্ণগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যথা, গায়ের রং, চোখের রং, চুলের গঠন, দৈহিক উচ্চতা, মস্তিষ্ক আকৃতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের প্রলক্ষণ হ'ল রক্ত রসায়ন তথা রক্ত নমুনা এবং রক্তে রীসাস্ উপাদান (Rh factor)। মানবজাতিকে তিনটি ব্যাপক বর্ণগোষ্ঠীতে সাধারণতঃ বিভক্ত করা হয়; ককেশীয়, মঙ্গোলীয় এবং নিগ্রো। এ সকল বর্ণগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তারণ ১২—চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠী : শ্বেতকায় ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ফর্সা রং, নীল, বাদামী বা কাল চোখ, ঢেউ খেলানো চুল, সরু ও উন্নত নাক এবং সরু ঠোঁট। অনুমান করা হয় যে, বিশুদ্ধ ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত পশ্চিম ইউরেশিয়ায়। এ অঞ্চল থেকে ককেশীয়রা অতীতে প্রচরণের (migration) মাধ্যমে ইউরোপের সর্বত্র, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে আঞ্চলিক উপগোষ্ঠীর জন্ম হয়। ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীতে তিনটি উপগোষ্ঠী চিহ্নিত করা যায়। (১) নর্ডিক (Nordic) : এই উপগোষ্ঠীর মানুষের গায়ের রং অত্যন্ত হালকা, ঢেউ-খেলানো চুল সোনালী বা লাল, চোখ নীল, নাক সরু এবং মাথা লম্বাটে এবং দেহ দীর্ঘকায়। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং উত্তর জার্মানীতে প্রধানত নর্ডিক উপগোষ্ঠীর ককেশীয়গণ বাস করে। অবশ্য ইউরোপের অন্যত্রও নর্ডিকদের বসবাস আছে। (২) আল্পীয় (Alpine) : এই উপগোষ্ঠীর মূল বৈশিষ্ট্য চওড়া মাথা, সোজা বা ঢেউ খেলানো বাদামী চুল, ঋষ্টপৃষ্ট দেহ এবং হালকা গায়ের রং। আল্পীয় উপগোষ্ঠী ইউরোপের সর্বত্রই দেখা যায়, তবে ইউরোপের মধ্যাঞ্চলে ফ্রান্স হতে পূর্ব দিকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এদের প্রাধান্য। (৩) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) : এই উপগোষ্ঠীর বিশেষ প্রলক্ষণ হচ্ছে লম্বা মাথা ও নাক, কৃষ্ণাভ চোখ এবং সুষম চেহারা। কিন্তু চুলের গঠন ও

www.pathagar.com

চিত্র—১২ ঃ প্রধান বর্ণগোষ্ঠীসমূহের ভৌগোলিক বিস্তারণ

www.pathagar.com

গায়ের রং-এ বেশ তারতম্য দেখা যায়। চুলের গঠন সোজা এবং ঢেউ-খেলানো—উভয় প্রকারের হয়। গায়ের রং হালকা জলপাই এর ন্যায় ধূসর সবুজ বর্ণ থেকে কৃষ্ণাভ দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই উপগোষ্ঠীর প্রধান বিস্তৃতি—অর্থাৎ দক্ষিণ ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় এই উপগোষ্ঠী সংখ্যাগুরু। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার পূর্বসীমা অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরাও ভূমধ্যসাগরীয় উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তাদের গায়ের রং অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয়দের তুলনায় যথেষ্ট কৃষ্ণাভ।

আধুনিককালে ইউরোপীয়গণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করেছে। ঐ সকল অঞ্চলের ককেশীয়রা প্রধানত উত্তর পশ্চিম ইউরোপীয়দের অনুরূপ। তবে উত্তর আমেরিকার ককেশীয়দের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়, কারণ সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ককেশীয়গণ প্রধানত পোর্তুগাল, স্পেন ও ইটালী থেকে আগত মানুষের বংশধর—তাই তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভূমধ্যসাগরীয় উপগোষ্ঠীর অনুরূপ।

মঙ্গোলীয় বর্ণগোষ্ঠী : পীতবর্ণের মঙ্গোলীয় বর্ণগোষ্ঠীর প্রধান শারীরিক প্রলক্ষণ হচ্ছে হালকা হলদে থেকে গাঢ় বাদামী গায়ের রং, বাদামী চোখ, সোজা ও কাল চুল, চ্যাপ্‌টা নাক, চওড়া মাথা, চোখের উপরের পাতায় ভাঁজ, উঁচু কপোল অস্থি এবং খর্বাকৃতি দেহ। অনুমান করা হয় যে, মঙ্গোলীয় জাতি মধ্য এশিয়ার স্টেপ তৃণভূমিতে উদ্ভূত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে মঙ্গোলিয়াতে বিশুদ্ধ মঙ্গোলীয় উপগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উত্তর পূর্ব এশিয়া, জাপান, কোরিয়া, চীন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ প্রধানত মঙ্গোলীয় অঞ্চল। কিন্তু ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক তারতম্য দেখা যায়। চীনা ও জাপানীদের তুলনায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলীয়দের গায়ের রং অপেক্ষাকৃত কম হলদে এবং অনেকাংশে কৃষ্ণাভ বাদামী রং-এ রূপান্তরিত হয়েছে। মঙ্গোলীয় বর্ণগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উপগোষ্ঠী আমেরিকার আদিবাসী তথা আমেরিকান ইণ্ডিয়ান বা "আমেরিণ্ডীয়" সম্প্রদায়। এশিয়ার উত্তর পূর্বে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে বিশ থেকে চল্লিশ সহস্র বছর পূর্বে যে মঙ্গোলীয় দল উত্তর আমেরিকায়

www.pathagar.com

প্রবেশ করে, আমেরিণ্ডীয়গণ তাদের বংশধর। বিচ্ছিন্নতার দরুন তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশুদ্ধ মঙ্গোলীয়দের থেকে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদের গায়ের রং গাঢ় বাদামী, কিন্তু অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যে এশীয় মঙ্গোলীয়দের সাথে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। আরও দুটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়—গ্রীনল্যাণ্ডের 'এস্কিমো' এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরাঞ্চলে 'ল্যাপ—মঙ্গোলীয় বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উপগোষ্ঠী।

নিগ্রো বর্ণগোষ্ঠী: কৃষ্ণকায় নিগ্রো বর্ণগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কাল গায়ের রং, কাল পশমতুল্য ও কুঞ্চিত চুল, চওড়া ও চ্যাপ্‌টা নাক, মোটা উল্‌টানো ঠোঁট এবং ঋষ্টপুষ্ট দেহ। পশ্চিম আফ্রিকার উষ্ণ সাভানা অঞ্চল এই বর্ণগোষ্ঠীর জন্মস্থান বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে সাহারার দক্ষিণে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিগ্রো বর্ণগোষ্ঠীর আবাসভূমি। কিন্তু এই বিরাট এলাকার নিগ্রো জনগণের মধ্যে যথেষ্ট শারীরিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে গায়ের রং বাদামী, নাক সরু বা চুল কোঁকড়া ইত্যাদি ঈষৎ পরিবর্তিত শারীরিক প্রলক্ষণ দেখা যায়। নিগ্রো বর্ণগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উপগোষ্ঠী আমেরিকান নিগ্রো। আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেখানে আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসদের বংশধর আমেরিকান নিগ্রো। কিন্তু আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ে ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই ককেশীয় প্রলক্ষণ দেখা যায়।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান বর্ণগোষ্ঠী ব্যতীত আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য কিন্তু কম ব্যাপক বর্ণগোষ্ঠী পৃথিবীর তিনটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করে। এসকল বর্ণগোষ্ঠী হচ্ছে দ্রাবিড়, পলিনেশীয় এবং অস্ট্রেলীয় (চিত্র—১২)। বলাবাহুল্য যে এই তিন গোষ্ঠীকে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ককেশীয়, মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো বর্ণগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভারতের আদি অধিবাসী এবং বর্তমানকালে দক্ষিণ ভারতে এই বর্ণগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। এই গোষ্ঠীর শারীরিক প্রলক্ষণ কৃষ্ণাভ বাদামী গায়ের রং, বাদামী চোখ, সুষম চেহারা, কাল ঢেউ-খেলানো চুল এবং লম্বা মাথা। অনেকে মনে করেন যে দ্রাবিড়দের সাথে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের প্রলক্ষণ-গত সাদৃশ্য আছে। পলিনেশীয় বর্ণগোষ্ঠী একটি মিশ্র জাতি। প্রশান্ত মহা-সাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ইস্টার দ্বীপ ও নিউজীল্যাণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপসমূহ পলিনেশীয়দের আবাসস্থল। এই বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায় এবং ককেশীয় ও মঙ্গোলীয় বর্ণগোষ্ঠীর সাথে তাদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে। পলিনেশীয়গণ মূলত বেশ লম্বা এবং শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়। তাদের গায়ের রং পীতাভ বাদামী, ঠোঁট সামান্য উল্টানো, নাক চওড়া এবং চুল কাল ও ঢেউ-খেলানো। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিগণ অস্ট্রেলীয় বর্ণগোষ্ঠীর মূল প্রতিনিধি। বর্তমানে এদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ব্যতীত শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা (Vedda), মালয়েশিয়ার সাকাই (Sakai) এবং ভারতের ভীল (Bhil), গণ্ড (Gond) ও ওরাওন (Oraon) উপজাতিসমূহকে এই বর্ণগোষ্ঠীর সদস্য বলে মনে করা হয়। অস্ট্রেলীয় বর্ণগোষ্ঠীর গায়ের রং কৃষ্ণাভ বাদামী বা লালচে কাল এবং চুল কাল ও ঢেউ-খেলানো। চেহারার গঠন ও আকৃতিতে অনেকটা দ্রাবিড়দের সাথে তাদের সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রেলীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাদের প্রলম্বিত ভ্রূঅস্থি, চওড়া নাক এবং মোটা ঠোঁট—যা অবশ্য নিগ্রোদের ন্যায় উল্টানো নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বর্ণগোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করে যাদের সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। খর্বাকৃতি নিগ্রীটো (Negrito) সম্প্রদায় এদের মধ্যে অন্যতম। মধ্য আফ্রিকা এবং পাপুয়া নিউগিনির পিগমি সম্প্রদায় এবং মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ভারতের আন্দামান দ্বীপের কতিপয় আদিবাসী সম্প্রদায় নিগ্রীটো বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের দৈহিক উচ্চতা সাধারণতঃ খুবই কম এবং গায়ের রং পীতাভ বাদামী ও চুল অতিশয় কুঞ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান ও হটেন্টট্ এর সাথে নিগ্রীটোদের চুল ও গায়ের রং এর সাদৃশ্য আছে। এ দুই সম্প্রদায়ের দৈহিক উচ্চতাও সাধারণতঃ বেশ কম এবং লক্ষণীয় ভারী নিতম্ব তাদের অন্যতম শারীরিক বৈশিষ্ট্য। বুশম্যানের চোখ মঙ্গোলীয়দের ন্যায় কিছুটা তির্যক এবং চোখের উপরের পাতায় সামান্য ভাঁজ দেখা যায়। বর্তমানে বুশম্যান ও হটেনটটের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। পাপুয়া-মেলানেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর বিস্তৃতি পাপুয়া নিউগিনি থেকে পূর্বদিকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠী বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করেছে। তাদের গায়ের রং কৃষ্ণাভ, চুল কুঞ্চিত, কিন্তু নাক উন্নত ও ঠোঁট

www.pathagar.com

নিগ্রোদের ন্যায় উল্টানো নয়। অস্ট্রেলীয় বর্ণগোষ্ঠীর সাথে পাপুয়া মেলানেশীয়দের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

বর্ণ ও সংস্কৃতি

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবজাতির সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার এক বর্ণ-ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্যে বর্ণ বা রেস্-এর প্রভাবের কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সংস্কৃতি একটি মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সৃষ্টি এবং তা জীনের (gene) মাধ্যমে নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে বংশানুগতভাবে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ মানবজাতির যে কোন বর্ণগোষ্ঠীর সদস্য যে কোন সংস্কৃতি গ্রহণ ও তার উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম। মানসিকতা বা বুদ্ধিমত্তার মান নির্ণয়ে বর্ণ বা রেস-এর প্রভাব আছে, এ ধারণাও সম্পূর্ণ অর্থহীন; কারণ কোন শারীরিক প্রলক্ষণ মানসিক গুণাগুণ প্রকাশ বা প্রভাবিত করে না। একটি মানবগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়ন ও প্রাযুক্তিক তৎপরতা তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কোন একক ব্যক্তির সাফল্য বা প্রগতি তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়—তার বর্ণগোষ্ঠীর কোন প্রভাব সেখানে নাই। মানবজাতির ইতিহাসের ধারা ও ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বর্ণ বা রেস্-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য : ভাষা

ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম মৌলিক উপাদান, ভাষা ব্যতীত কোন সংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই। ভাষার মাধ্যমে মানবসমাজের সকল মতবাদ ও চিন্তাধারা এক গোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠী এবং বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়; মানবজাতির সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির সংরক্ষণ, হস্তান্তর ও পরিবর্ধনের প্রধান বাহক ভাষা। নিরক্ষর সমাজে যেখানে বর্ণমালার কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানেও পুরুষানুক্রমে কথিত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি পরিবাহিত হয়। প্রথমেই ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। মানুষের কণ্ঠনালী থেকে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ শব্দ সৃষ্টির নাম ভাষা এবং ঐ ভাষা কোন একটি মানবগোষ্ঠীর সদস্যদের নিকট বোধগম্য ও ব্যবহার্য হতে হবে। প্রত্যেক ভাষায় বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্নতা দেখা যায়। ভাষার যে সংস্করণটি শিক্ষা ও সরকারী পর্যায়ে সাধারণত ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রমাণ ভাষা বা আদর্শ ভাষা (standard language) বলে। অবশ্য এই আদর্শ ভাষার বহু প্রকার পরিবর্তিত সংস্করণ প্রচলিত থাকতে পারে। মূল প্রমাণ ভাষা থেকে উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও শব্দ চয়নের তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত হয়, তাকে স্থানিক ভাষা বা উপভাষা (dialect) বলে। অনেক সময় মূল ভাষা ও স্থানিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ এতখানি বেশী অনুভূত হয় যে স্থানিক ভাষাটি একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে দাবী করতে পারে।

এ অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃতির পটভূমিতে পৃথিবীব্যাপী ভাষার ভৌগোলিক বিস্তারণ পরীক্ষা করব। কিন্তু তার পূর্বে ভাষার শ্রেণীবিভাজনের মূল সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু ভাষার বিশুদ্ধ সংজ্ঞা এবং ভাষা ও স্থানিক ভাষার মধ্যে তারতম্যের ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করেছেন, তাই ভাষাসমূহে শ্রেণীকরণ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ২৫০০ থেকে ৩৫০০ ভাষার প্রচলন আছে এবং তার মধ্যে প্রায় এক হাজার ভাষা কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে ৩০০০ ভাষার

www.pathagar.com

ভৌগোলিক বিস্তারণ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং কোন এক পর্যায়ে একই ভাষা হ'তে বিভিন্ন ভাষা জন্মলাভ করলেও সে সকল ভাষার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত ভাষাসমূহ নিয়ে একটি ভাষাগোষ্ঠী (language family) গঠিত হয়। ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ সাধারণত এক ও অভিন্ন উৎস থেকে জন্মলাভ করে ক্রমশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীকে আবার কয়েকটি উপ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় এবং উপগোষ্ঠীর সদস্য হচ্ছে নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত স্বতন্ত্র ভাষাসমূহ। পৃথিবীর সকল ভাষা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজনে একটি প্রধান অন্তরায়। যে পরিমাণ তথ্য ভাষাবিজ্ঞানীরা বর্তমানে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন, তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল ভাষাসমূহকে দশটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীতে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই গোষ্ঠীসমূহ ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগোষ্ঠী চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে প্রধান দশটি ভাষাগোষ্ঠী এবং তাদের প্রচলনের প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ (চিত্র—১৩) তালিকাভুক্ত করা হ'ল।

ভাষাগোষ্ঠী	প্রচলন
(১) ইন্দো-ইউরোপীয়	উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; ইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়ন; অস্ট্রেলিয়া; নিউজীল্যাণ্ড; দক্ষিণ আফ্রিকা; ইরান; দক্ষিণ এশিয়া।
(২) হ্যামিটিক-সেমিটিক	উত্তর ও উত্তর পূর্ব আফ্রিকা; দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া।
(৩) উরাল-আলতাই	উত্তর সোভিয়েট ইউনিয়ন; মধ্য এশিয়া; তুরস্ক; হাঙ্গেরী; ফিনল্যাণ্ড।
(৪) নাইজার-কঙ্গো-বান্টু	পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

www.pathagar.com

চিত্র—১৩ ঃ ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তারণ

www.pathagar.com

ভাষাগোষ্ঠী	প্রচলন
(৫) চীনা-তিব্বতী	চীন ; বার্মা ; থাইল্যাণ্ড ; পূর্ব কাশ্মীর ; উত্তরপূর্ব ভারত।
(৬) দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারত।
(৭) মালয়-পলিনেশীয়	মালয়েশিয়া ; ইন্দোনেশিয়া ; ফিলিপাইন ; মালাগাসী।
(৮) জাপানী ও কোরীয়	জাপান ; উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া।
(৯) পাপুয়া-অস্ট্রেলীয়	পাপুয়া-নিউগিনি ; অস্ট্রেলীয়া।
(১০) আমেরিণ্ডীয়	উত্তর কানাডা ; মধ্য আমেরিকা ; দক্ষিণ আমেরিকা।

পৃথিবীর সকল ভাষাগোষ্ঠির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির ভৌগোলিক বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর সকল মহাদেশেই এই গোষ্ঠীভুক্ত কোন ভাষার প্রচলন রয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসাধারণ এই গোষ্ঠির কোন এক ভাষায় কথা বলে। ভাষাবিদদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব-মধ্য ইউরোপে এক প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমান যুগের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ ঐ সাধারণ সূত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে ইংরেজী—যা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় এবং ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ দেশসমূহেও এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠিকে কয়েকটি উপগোষ্ঠিতে বিভক্ত করা যায় ; যথা (১) কেল্টিক (Celtic) : স্কটল্যাণ্ডের গেইলিক (Gaelic) ও ওয়েলসের ওয়েল্শ্ (Welsh) ; (২) রোম্যান্স্ (Romance) : ফরাসী, স্প্যানীশ, পোর্তুগীজ ও ইটালীয় ; (৩) জার্মানিক (Germanic) : জার্মান, সুইডিশ নরওয়েজীয়, ডেনীশ, ডাচ (Dutch) ও ইংরেজী ; (৪) বাল্টিক (Baltic) ল্যাটভীয় ও লিথুয়েনীয় ; (৫) স্লাভিক (Slavic) : পূর্ব ইউরোপের চেক, স্লোভাক সার্বোক্রোশীয়, স্লভেনীয়, ম্যাসিডনীয়, পোলিশ, বুলগেরীয় এবং সোভিয়েট

www.pathagar.com

ইউনিয়নের ইউক্রেনীয় ও রুশ ; (৬) গ্রীক (Greek) ; (৭) আলবেনীয় (Albanian) ; এবং (৮) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) : ফার্সী, পুশতু, কুর্দি, বালুচী, হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী, উড়িয়া, অসমীয়া, সিংহলী ইত্যাদি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবগোষ্ঠীর প্রচরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক বিস্তৃতি ও ক্রমবিবর্ধন ঘটেছে।

হ্যামিটিক-সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। এ গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ভাষা হচ্ছে আরবী, ইসরাইলের হিব্রু, উত্তর আফ্রিকার বর্বর (Berber), সোমালিয়ার সোমালী এবং ইথিওপিয়ার আম্‌হারিক (Amharic)। উরাল-আলতাই ভাষাগোষ্ঠী সোভিয়েট ইউনিয়নের সাইবেরিয়া অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর সম্প্রসারণের ফলে পরবর্তী কালে পশ্চিমে ইউরোপের কতিপয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। উত্তর সাইবেরিয়ার সামোয়েদ (Samoyed), ইয়াকুত (Yakut) ও ল্যাপ (Lapp) ; ফিনল্যাণ্ডের ফিনিশ (Finnish) ; মধ্য এশিয়ার কাজাক, উজবেক, তুর্কমান্, কিরগিজ, উইগুর ও মঙ্গোলীয় ; তুরস্কের তুর্কী ; এবং হাঙ্গেরীর মাগীয়ার (Magyar) ভাষা উরাল-আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাহারার দক্ষিণে প্রচলিত আফ্রিকার অসংখ্য ভাষাকে মূলতঃ নাইজার-কঙ্গো-বাণ্ট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সকল ভাষা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার হাউসা (Housa), ইওরুবা (Yoruba), ইবো, ফুলানী, মোসি, আকান্ ; মধ্য আফ্রিকার মোংগো (Mongo) ; পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি (Swahili) ; দক্ষিণ আফ্রিকার শোনা (Shona) ইত্যাদি।

চীনা-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠী কেবলমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমাবদ্ধ হলেও বহু লোকের মাতৃভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চীনা-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা চীনাভাষা, যা গণচীন, তাইওয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। তিব্বতী, বর্মী, থাই এবং পূর্ব কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভাষা চীনা-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ায় আর্যদের আগমনের পূর্বে সারা উপমহাদেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের (তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালায়ালাম) প্রচলন কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীতে মালয়েশীয় ইন্দোনেশীয় ও ফিলিপিনো ভাষা উল্লেখযোগ্য। তবে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিকট অবস্থিত দ্বীপ, মালাগাসীর ভাষাও এই গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় এবং তা প্রাচীনকালে মালাগাসীর সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে। জাপানী ও কোরীয় ভাষাদ্বয়কে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা হলেও ঐ দু'টি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। বস্তুতপক্ষে, উভয় ভাষাই একটি সম্পূর্ণ পৃথক উপগোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন ভাষাকে শ্রেণীবিভাজনের সুবিধার্থে "আমেরিণ্ডীয়" ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল ভাষা উত্তর কানাডা; মধ্য আমেরিকায় মেক্সিকো ও গুয়াতেমালা; দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, গাইয়ানা (Guyana), ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়াদোর, পেরু, বলিভিয়া ও চিলির আদিবাসীদের মাতৃভাষা। অনুরূপভাবে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ভাষা এবং পাপুয়া-নিউগিনিতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাকে যুক্তভাবে পাপুয়া-অস্ট্রেলীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রধান ভাষাগোষ্ঠীসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাষার প্রচলন দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে কাম্পুচিয়ার মন্ খ্মের (Mon Khmer); লাওসের লাও; উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতীয় ভাষা মুন্ডা; ভারত মহাসাগরের আন্দামানী; ভিয়েতনামের ভিয়েৎনামী; মধ্য আফ্রিকার সাহারা ও সুদানী; দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশম্যান-হটেনটটদের ভাষা খোইসান (Khoisan); ককেশাস পর্বত এলাকায় প্রচলিত ককেশীয়; স্পেনের উত্তরাঞ্চলের বাস্ক্ (Basque); এবং উত্তর কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো।

www.pathagar.com

দ্বিভাষাবাদ (Bilingualism)

সবাই নিজকে সাধারণত নিজ ভাষার সাথেই চিহ্নিত করে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে পৃথিবীর বহু লোক নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত অপর কোন একটি ভাষা ব্যবহারেও সমপরিমাণে দক্ষ। এ সকল দ্বিভাষী লোক ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি বা রাজনীতির প্রয়োজনে একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। যে সকল দেশে একটিমাত্র ভাষা সকল জনসাধারণের মাতৃভাষা নয়, সেখানে দ্বিভাষাবাদের প্রয়োজন দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতে হিন্দী ও ইংরেজী, কানাডার ইংরেজী ও ফরাসী, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ও আফ্রিকান্ (Afrikaan); পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় ইংরেজী বা ফরাসী এবং একটি স্থানীয় ভাষা ইত্যাদি দ্বিভাষী সমাজের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া যে সকল দেশে একটিমাত্র ভাষাই সকলের মাতৃভাষা, সেখানেও শিক্ষিত সমাজে ইংরেজী বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা চর্চার প্রবণতা দেখা যায় এবং তার ফলে ঐ সমাজ দ্বিভাষীরূপে পরিগণিত হয়।

দ্বিভাষাবাদের অপর এক রূপ হচ্ছে লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা (lingua franca) বা সার্বজনীন ভাষা। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমরূপে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাকে লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা বলে। ব্রিটিশ কমন-ওয়েল্থ্ দেশসমূহে ইংরেজী এই ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশসমূহে ফরাসী এখনো সার্বজনীন ভাষা-রূপে প্রচলিত রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে যথাক্রমে হাউসা ও সোয়াহিলি ভাষাদ্বয় লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা রূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষার পরিবর্তিত ও বিকৃত সংস্করণ জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরিশেষে ঐ বিকৃত ভাষাই লিংগুয়া ফ্রাঙ্কারূপে পরিচিত হয়। প্রতিষ্ঠিত ভাষার এই বিকৃত সংস্করণকে "পিজিন" (pidgin) বলে। 'পিজিন' শব্দটি চীনাদের দ্বারা ইংরেজী "বিজনেস" (business) শব্দের বিকৃত রূপ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং আফ্রিকার বহু দেশে 'পিজিন' ইংরেজী ও 'পিজিন' ফরাসী সার্বজনীন ভাষার মর্যাদা পেয়েছে এবং এ সকল ভাষা ইংরেজী, ফরাসী বা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা ব্যতীত স্থানীয় ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণের নীতিমালায় সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

বর্ণ ও ভাষা

আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রধান বর্ণগোষ্ঠীসমূহের ভৌগোলিক বিস্তারণের সাথে ভাষাগোষ্ঠীর বিস্তারণের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। অধিকাংশ ককেশীয়গণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা, মঙ্গোলীয়গণ প্রধানত চীনা-তিব্বতী ভাষা এবং নিগ্রোগণ নাইজার-কঙ্গো-বান্টু ভাষা বলে। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ হ্যামিটিক-সেমিটিক ভাষা বলে থাকে। ভাষাগোষ্ঠী ও বর্ণগোষ্ঠীর সাদৃশ্য আধুনিক যুগে পৃথিবীব্যাপী মানুষের প্রচরণ ও মিশ্রণের ফলে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বহু নিগ্রোগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণের বর্তমান মাতৃভাষা হ্যামিটিক-সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আবার আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আনীত নিগ্রো ক্রীতদাসদের বংশধরগণ নিজ ভাষা ত্যাগ করে স্থানীয় প্রচলিত ভাষা (ইংরেজী, স্প্যানীশ, পোর্তুগীজ বা ফরাসী) মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেছে। অপরদিকে উরাল-আলতাই ভাষার প্রচলন এশিয়ার মঙ্গোলীয় এবং ইউরোপের ককেশীয় (হাঙ্গেরী ও ফিনল্যাণ্ড)—উভয় বর্ণগোষ্ঠীতে দেখা যায়। সুতরাং, ভাষা ও বর্ণের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখানে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণ বা 'রেস্' (race) জীনের (gene) মাধ্যমে বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়, কিন্তু ভাষাজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ও পরিবাহিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ঃ ধর্ম

ধর্ম সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান এবং পৃথিবীব্যাপী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্মের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ বিভিন্নধর্মী হওয়ায় ধর্মের একটি সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়াও সহজ নয়। মূলতঃ একটি অতি প্রাকৃতিক, পবিত্র ও সর্বশক্তিমান অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাস ধর্মের মূলমন্ত্র। অবশ্য এই ধর্মবিশ্বাস একেশ্বরবাদীও হতে পারে, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু-ইশ্বরবাদী ও পিতৃপুরুষ উপাসনার রূপ নিতে পারে। আদিম অধিবাসীদের ধর্মে জীবজন্তু, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ ইত্যাদি উপাসনার বস্তু এবং এ জাতীয় ধর্মবিশ্বাসকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে। ধর্ম কেবলমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসনই নিয়ন্ত্রিত করে না, বরং মানুষের প্রাত্যহিক জীবন তথা সামগ্রিক জীবনধারাকেও প্রভাবিত করে থাকে। অবশ্য সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, কারণ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ধর্ম সাধারণত একটি অলক্ষ্য স্থানে উপনীত হয়েছে এবং সংস্কৃতির অন্যতম প্রভাবকারী শক্তিরূপে ধর্মের ভূমিকা সেখানে সীমিত হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি পরিব্যাপক শক্তিরূপে কাজ করেছে। কোন কোন সময় ও অঞ্চলে ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম একতা এনে দিয়েছে, আবার কোথাও হয়ত একই ভাষার সম্প্রদায়কে ধর্মীয় কারণে বিভক্ত করেছে। মানুষের জীবন-যাত্রা ও সমাজের কাঠামো নিরূপণে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি বিভিন্ন দেশের আইন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশেও ধর্মের ছাপ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রসারণের সাথে সাথে নিজস্ব ধর্মীয় ভাষার প্রসার ঘটেছে। দৈনন্দিন কাজ যেমন, শস্য রোপণ বা ফসল কাটার সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও ধর্মে বিভিন্ন রীতি ও প্রথা প্রচলিত হয়েছে, যেমন মুসলমান ও গোঁড়া ইহুদীদের জন্য শূকরের মাংস এবং হিন্দুদের জন্য গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। সামাজিক

www.pathagar.com

জীবনে বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের এরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

ভাষার তুলনায় ধর্মের সংখ্যা তত বেশী নয়। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক পাঁচটি প্রধান ধর্মের যে কোন একটির অনুসারী। এই পাঁচটি ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, খ্রীস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম। এদের মধ্যে ইসলাম, খ্রীস্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠী ও জাতিতে এ সকল ধর্মের প্রসার ঘটেছে। আবার ইসলাম, খ্রীস্ট ধর্ম ও ইহুদী ধর্মকে সাধারণত একেশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। কারণ এক ও অদ্বিতীয় বিধাতার অস্তিত্বে এ সকল ধর্মবিশ্বাসী। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঠিক জনসংখ্যা কত হবে তা বলা কঠিন। সুতরাং, নিম্নের তালিকা শুধুমাত্র একটি মোটামুটি ও আনুমানিক পরিসংখ্যান।

ধর্ম	জনসংখ্যা
খ্রীস্ট ধর্ম	৯৬ কোটি
ইসলাম ধর্ম	৬০ কোটি
হিন্দু ধর্ম	৫২ কোটি
বৌদ্ধ ধর্ম	২৫ কোটি
ইহুদী ধর্ম	১·৫ কোটি

উপরের তালিকা অনুযায়ী পৃথিবীতে খ্রীস্টানদের জনসংখ্যা সর্বাধিক এবং মুসলমানদের স্থান দ্বিতীয়। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে কম্যুনিষ্ট গণচীনে প্রকাশ্য ধর্ম পালনের সুযোগ না থাকায় বৌদ্ধ ধর্মের সাবিক ও সঠিক জনসংখ্যা নিরূপণ সম্ভব নয়।

পাঁচটি প্রধান ধর্মের উৎসস্থল প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির মধ্যে পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর ভারতে উৎপত্তি লাভ করে। অপরদিকে খ্রীস্ট ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইনে এবং ইসলাম ধর্ম আরবের পশ্চিমাঞ্চলে (মক্কা-মদিনা) সূচিত হয়। নিম্নে আবির্ভাবের কালক্রমানুসারে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক চরিত্র, উৎপত্তি ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি (চিত্র—১৪) আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চিত্র—১৪ঃ ধর্মের ভৌগোলিক বিস্তৃতি

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্ম

পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম প্রাচীনতম। অনুমান করা হয় যে, আর্যদের দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে আগমনের পর প্রায় ১০০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের সময় থেকে আর্য ও দ্রাবিড় ধর্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির সংমিশ্রণের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোআব অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের উন্মেষ ঘটে এবং কালক্রমে তা একটি সংগঠিত ধর্মে পরিণত হয়। এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর কোন প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা নেই এবং দৈবভাবে প্রাপ্ত কোন গ্রন্থ নেই। "কর্ম" হিন্দু ধর্মের মৌলিক মতবাদ এবং এ মতবাদের সাথে পুনর্জন্ম মতবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হ'ল যে সকল প্রাণী একটি আনুক্রমিক শ্রেণীবিভাগের সদস্য এবং নিজ কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জীবনে প্রতিটি প্রাণী উচ্চতর বা নিম্নতর প্রাণীতে পুনর্জন্ম লাভ করবে। হিন্দু ধর্মের অপর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য জাত প্রথা, (caste system) যার ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলেই কোন এক সামাজিক স্তর বা জাতের সদস্য। সামাজিক স্তর বা জাতসমূহ বহুস্তর আনুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ ও কর্মফলের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য আধুনিককালে নিম্নতম জাত বা "হরিজন"দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি ক্রমশ পরিহার করা হচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম প্রধানত ভারতে সীমাবদ্ধ। ভারতের প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভারত ব্যতীত হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা ও শ্রীলঙ্কাতে সংখ্যালঘু পর্যায়ে পাওয়া যায়। স্বল্প পরিমাণে হিন্দু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব থেকে কিছু ভারতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিক কাম্পুচিয়া, ভিয়েৎনাম, লাউস, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু ধর্মের প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে অবশ্য ইসলাম ধর্ম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে হিন্দু ধর্মকে প্রতিস্থাপিত করে। ব্রিটিশ শাসনকালে বহু সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ঐ সকল অঞ্চলের শ্রম ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তার ফলে ঐ সকল এলাকায় শ্রমিকদের দ্বারা আনীত হিন্দু ধর্মের অনুশীলন এখনও দেখা যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নেপালের পাদদেশে অবস্থিত এক রাজ্যের রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। তিনি পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। হিন্দু ধর্মের

www.pathagar.com

জাতপ্রথা ও অন্যান্য অপ্রিয় আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে সহায়তা করে। গৌতম বুদ্ধ মানুষের কষ্ট ও দারিদ্র্যে কাতর হয়ে মুক্তি বা "নির্বাণ" লাভের কতিপয় পথ-নির্দেশ করেন, যেমন, নিজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, কামনা ও লালসাকে জয় করা, বিশুদ্ধ সততা এবং অহিংসা বা কোন প্রাণীর ক্ষতিসাধন না করা।

নেপাল সীমান্তে উত্তর ভারতের কপিলাবস্তু বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল। ৪৮৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম অতি ক্ষীণভাবে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর থেকে এই ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রসার লাভ করে এবং ভারতের বাইরেও অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রচার-কার্যের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম শতাব্দীতে চীন, চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়া, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বার্মা ও জাপান এবং সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান অর্থাৎ ভারতে এই ধর্ম সংখ্যালঘু, কিন্তু শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কম্যুনিস্ট শাসনের পূর্বে চীনের অধিকাংশ জনসাধারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। অনুরূপভাবে কম্যুনিস্ট শাসিত মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, কাম্পুচিয়া ও ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত মান ও অনুশীলন অস্পষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মে দু'টি চিন্তাধারা জন্ম নেওয়ার পর বর্তমানে ঐ ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত : হীনযান ও মহাযান। হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রধানত শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত এবং চীন, জাপান তথা পূর্ব এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন দেখা যায়।

ইহুদী ধর্ম

ইহুদী ধর্ম দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে উদ্ভূত প্রাচীনতম ধর্ম। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে ইহুদীদের সেমিটিক ও যাযাবর পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিতে বিচরণ করত। ঐ অঞ্চলের কৃষিজীবী অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট হতে তারা জীবনযাত্রা ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা ধ্যানধারণা গ্রহণ করে। কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহুদীধর্মকে তৎকালীন অন্যান্য সেমিটিক ধর্ম থেকে পৃথক পরিচয় দিয়েছিল। হযরত ইব্রাহিমের বাণী ও শিক্ষা ইহুদী ধর্মের ভিত্তি

www.pathagar.com

প্রস্তর স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে ইহুদীগণ হযরত মুসার নেতৃত্ব লাভ করে। ইহুদীগণ তাদের ইতিহাসে বহু উত্থানপতনের সম্মুখীন হয়েছে। ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়গণ কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হওয়ার পর ইহুদীগণ নির্বাসিত হয় এবং ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমানগণ ঐ শহর ধ্বংস করার ফলে ইহুদীগণ সম্পূর্ণরূপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে ইহুদীগণ বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যমূলক নীতির দ্বারা নিপীড়িত হয়। এর ফলে বহু সংখ্যক ইহুদী যুক্তরাষ্ট্রে ভাগ্যান্বেষণে চলে যায়। ধীরে ধীরে ইহুদীদের মধ্যে একটি নিজস্ব আবাসভূমি গঠনের আন্দোলন গড়ে উঠে, যা সাধারণত জাইঅন্-বাদ (Zionism) নামে পরিচিত। পরিশেষে. জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (ইসরাইল) গঠিত হয়। কিন্তু এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক আরব অধিবাসীকে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ধর্মের মধ্যে ইহুদী ধর্মাবলম্বীর জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। পৃথিবীর অধিকাংশ ইহুদী ইসরাইলের বাইরে বসবাস করে। পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, পোল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইহুদী সম্প্রদায় আছে। বর্তমানে ইহুদী ধর্ম তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আদিকালের অপরিবর্তিত ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের উপর গুরুত্বের মান অনুযায়ী এই তিনটি সম্প্রদায় হচ্ছে গোঁড়া, রক্ষণশীল ও সংশোধিত ইহুদী। ইসরাইলে গোঁড়া সম্প্রদায় অধিক প্রভাবশালী, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অপর দুই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

খ্রীস্ট ধর্ম

খ্রীস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীস্ট প্যালেস্টাইনে অবস্থিত গ্যালিলির অধিবাসী ছিলেন। তিনি রোমানদের দমনমূলক শাসন থেকে মুক্তির দূতরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বিশ্বজনীন প্রেমের বাণী প্রচার করে খ্রীস্ট ধর্মের সূচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম শিষ্য পল (Paul) কর্তৃক প্রচারকার্যের ফলে খ্রীস্ট ধর্ম ইউরোপে গ্রীস এবং রোমে প্রবর্তিত হয়। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ (Constantine) খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর খ্রীস্ট ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

যুগে খ্রীস্ট ধর্ম পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার ফিলিপাইনে খ্রীস্ট ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। খ্রীস্ট ধর্ম মূলতঃ তিনটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত : ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট এবং প্রাচ্য খ্রীস্টান। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ ব্যতীত সমগ্র মহাদেশীয় ইউরোপে ক্যাথলিক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা প্রধানত ক্যাথলিক। এছাড়া কানাডার ফরাসী-ভাষী অঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং ফিলিপাইনে ক্যাথলিকদের প্রাধান্য দেখা যায়। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান নেতা মহামান্য পোপের কেন্দ্রীয় দপ্তর রোমের ভাটিকান শহরে অবস্থিত।

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে জার্মান পাদ্রী মার্টিন লুথার ক্যাথলিকদের বিভিন্ন গোঁড়ামির প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার ফলস্বরূপ প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসন রোম থেকে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে স্থানান্তরিত করার পর ঐ শহরে প্রাচ্যীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। কালক্রমে ঐ সম্প্রদায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমগ্র পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাচ্যীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। অবশ্য গ্রীস, সাইপ্রাস এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার খ্রীস্টানগণ এই সম্প্রদায়ের সদস্য।

ইসলাম

ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মক্কাবাসী হযরত মুহম্মদ (দঃ) ঐশ্বরিক বাণী লাভের পর ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের মূলমন্ত্র এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং মুহম্মদ (দঃ) এর পূর্ববর্তী সকল নবীর কর্ম ও গুরুত্ব স্বীকার করে তাঁকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বররূপে গ্রহণ। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি করণীয় দায়িত্ব হচ্ছে—

www.pathagar.com

ইমান, নামাজ, রোজা, যাকাত এবং হজ। মুহম্মদের (দঃ) কাছে প্রেরিত সকল দৈববাণী মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরীফে সংকলিত আছে এবং এ গ্রন্থ কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনের নীতিমালা নয়, বরং মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত নির্দেশাবলীর রূপরেখা দেওয়া আছে।

মুহম্মদ (দঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হ'তে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনা চলে আসতে হয়—যা মুসলমানদের নিকট সাধারণত "হিজ্‌রত" নামে অভিহিত। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদের (দঃ) মৃত্যুর সময় গোটা আরব দেশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যে এক বিস্ময়কর হারে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে মুসলমানগণ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী; এবং উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া; দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ধর্ম ইসলাম। তাছাড়া ভারত, ফিলিপাইন, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে।

খ্রীস্ট ও ইহুদী ধর্মের অনুরূপ মুসলমানগণ দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত: সুন্নী ও শিয়া। সুন্নী মুসলমানদের জনসংখ্যা শিয়াদের অপেক্ষা প্রায় আটগুণ বেশী; ইরান ও সংলগ্ন ইরাকীয় অঞ্চল, সিরিয়া, লেবানন, ভারত ও পাকিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ বাস করে। অন্য সকল অঞ্চলে সুন্নী সম্প্রদায়ই একমাত্র মুসলমান গোষ্ঠী।

অন্যান্য ধর্ম

উপরে আলোচিত পাঁচটি প্রধান ধর্ম ব্যতীত কয়েকটি আঞ্চলিক ধর্মের এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন চীনা দার্শনিক কন্‌ফুশিয়াস (Confucius)-এর শিক্ষার মাধ্যমে কন্‌ফুশিয়াসবাদের জন্ম হয়। কন্‌ফুশিয়াস চীনা সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী, তথা গোটা চীনা জীবনযাত্রার একটি বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি পরলোক

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে মানুষের বর্তমান পার্থিব জীবনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। কনফুশিয়াস দেশকে একটি সংসারের সাথে তুলনা করেন এবং সরকার ও প্রজা সম্বন্ধকে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের উপমা দিয়েছেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান্ (Han) রাজবংশীয় শাসনকালে কনফুশিয়াসবাদ রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করে এবং পরবর্তী দু হাজার বছর পর্যন্ত এই ধর্মীয় মতবাদ চীনা শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে কনফুশিয়াসের সমসাময়িক অপর এক চীনা শিক্ষক—লাও সে (Lao Tse) ভিন্ন এক চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ—"তাও" (Tao)-এ তিনি প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা ও অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাও ধর্ম মানুষকে প্রধানত সরলতা, শান্তি, আত্মিক স্বাধীনতা ও জ্ঞান অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাও ধর্ম প্রবর্তকের মৃত্যুর পর অনেকে ঐ ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ায় তার প্রকৃত রূপ হারিয়ে যায়। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম আবির্ভাবের পর কনফুশিয়াসবাদ ও তাও ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্ম অনায়াসেই মিশে যায় এবং পরিশেষে ঐ তিন ধর্মের সংমিশ্রণে এক অনুপম চীনা ধর্মীয় ব্যবস্থা রূপ নেয়।

চীনের ন্যায় জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম শিন্টো (Shinto)। শিন্টো ধর্ম সম্রাটকে বিধাতার অবতাররূপে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃতি ও পিতৃপুরুষ উপাসনা এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে শিন্টো ধর্মের চর্চা অনেকখানি সীমিত হয়ে পড়ে, কিন্তু গত শতাব্দীতে শিন্টো ধর্ম পুনরুজ্জীবিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং তা রাজধর্মের স্বীকৃতি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর শিন্টো ধর্মের বিশেষ রাজকীয় মর্যাদা লোপ পায় এবং সম্রাটের ঐশ্বরিক উদ্ভব অস্বীকার করা হয়।

ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ধর্ম শিখ ধর্ম। ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের জাত প্রথা ও পৌত্তলিক প্রথার প্রতিবাদে একেশ্বরবাদী শিখ ধর্ম পাঞ্জাবে জন্ম নেয় এবং পরবর্তীকালে এই ধর্ম শিখদের মধ্যে এক স্বকীয় চেতনাবোধের সৃষ্টি করে। বর্তমানে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্য শিখদের প্রধান আবাসস্থল।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

জনপদ ঃ গ্রামীণ

বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ যে সকল সুবিধাদি নির্মাণ করে থাকে, ভূগোলবিদদের নিকট তা জনপদ নামে পরিচিত। আশ্রয়ের জন্য নির্মিত গৃহ, গৃহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাদি, যোগাযোগের জন্য পথঘাট ইত্যাদি জনপদের (settlements) অন্তর্ভুক্ত। জনপদের আকৃতি ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বকীয় বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে, জনপদ সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। জনপদ মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ বহু শতাব্দী ধরে একটি জনপদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং সকল জনপদের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে; এতে প্রাচীন ও নবীনের পর্যায়ক্রমিক মিশ্রণের রূপ এবং সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির বিভিন্ন স্তরের মান প্রোথিত থাকে। জনপদের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতির চরিত্র অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং সেজন্য সাংস্কৃতিক ভূগোলে জনপদের বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য বিষয়বস্তু।

ভূগোলবিদগণ সাধারণত জনপদকে গ্রামীণ ও নগরীয়- এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, আধুনিককালে এই পার্থক্য অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ও নগরীয় জনপদের মধ্যে পার্থক্য একটি আপেক্ষিক পার্থক্য মাত্র। এই দুই প্রকার জনপদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের কোন সর্বজনস্বীকৃত বিধি নেই। সাধারণত মনে করা হয় যে, গ্রামীণ জনপদের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট তৎপরতা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এবং পক্ষান্তরে নগরীয় জনপদের মানুষ খাদ্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, বরং তারা দ্বিতীয় (secondary), তৃতীয় (tertiary) ও চতুর্থ (quarternary) পর্যায়ের তৎপরতা, যথা, শিল্প, বাণিজ্য বা পেশাগত তৎপরতায় নিয়োজিত থাকে। শ্রেণীবিভাজনের সুবিধার্থে অনেক সময় জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামীণ ও নগরীয় জনপদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু এই জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্য নেই। ডেনমার্কের ২৫০ জনের অধিক যে কোন জনপদকে নগরীয় বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু নগরীয় জনপদ বলে গণ্য হওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের নূন্যতম জনসংখ্যা এরূপ ঃ কানাডায় ১০০০; পানামাতে ১৫০০; আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী ও পোর্তুগালে ২০০০; মেক্সিকো

www.pathagar.com

ও যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০০ ; বাংলাদেশ ও ভারতে ৫০০০ ; এবং সুইজারল্যাণ্ড ও স্পেনে ১০,০০০। যা হোক, যে বৈশিষ্ট্যটি গ্রামীণ জনপদের স্বকীয় ও সার্বজনীন, সেটি হচ্ছে তার কৃষিভিত্তিক জীবনধারা। এ অধ্যায়ে গ্রামীণ জনপদের একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনপদের ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত একটি বিচ্ছিন্ন খামার বাড়ী (farmstead) যেখানে মানুষ ও পশুর আশ্রয়ের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি গৃহের সমষ্টিতে একটি "পল্লী পাড়া" বা "ক্ষুদ্র গ্রাম" (hamlet) গড়ে উঠে। আরও বৃহত্তর পর্যায়ে অনেকগুলি গৃহের সমষ্টিতে একটি প্রকৃত গ্রামের সৃষ্টি হয়। এ সকল গ্রামীণ জনপদকে আকৃতি (form) অনুসারে দুটি প্রধান প্যাটার্নে বিভক্ত করা হয় : পুঞ্জীভূত (clustered) এবং বিক্ষিপ্ত (dispersed)।

পুঞ্জীভূত জনপদ

যে গ্রামের গৃহসমূহ একে অপরের সাথে সন্নিবিষ্ট ও পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে তাকে পুঞ্জীভূত গ্রাম বলে। গ্রামের সকল গৃহ একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় এবং বসতি এলাকার বাইরে কৃষি বা চরণভূমি দেখা যায় (চিত্র—১৫)।

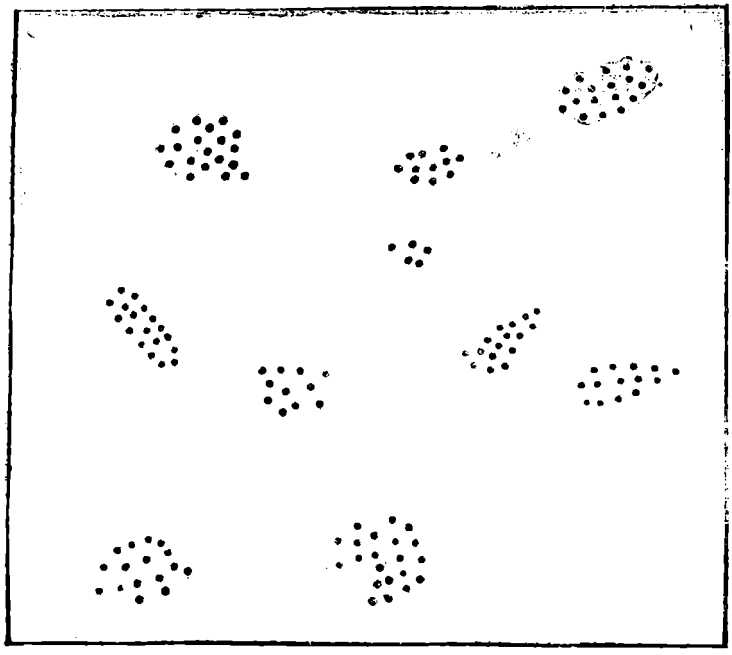

চিত্র—১৫ : পুঞ্জীভূত জনপদ

www.pathagar.com

কোন কোন গ্রামে স্কুল, পোস্ট অফিস ও মসজিদ বা মন্দিরও থাকতে পারে; কিন্তু সকল প্রকার গৃহ একই স্থানে জড় অবস্থায় থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, পুঞ্জীভূত জনপদে একটি গির্জা বা হাট বসতির প্রাণ-বিন্দুরূপে পরিগণিত হয় এবং ঐ গির্জা বা হাটের চতুষ্পার্শে পুঞ্জীভূতভাবে সকল আবাসিক ও অন্যান্য গৃহ নির্মিত হয়। এরূপ পুঞ্জীভূত জনপদকে কেন্দ্রীভূত (nucleated) জনপদও বলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত জনপদ বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির রূপ নিতে পারে, যেমন রৈখিক (linear) বা বৃত্তাকার (ring বা circular)। কোন নদী বা রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে গৃহ নির্মাণের ফলে যে সরু ও দীর্ঘায়িত জনপদ সৃষ্টি হয়, তাকে রৈখিক জনপদ বলে (চিত্র—১৬ ক)। নদী ও রাস্তাটি পরিবহণের কাজ করে এবং গ্রামবাসীদের কৃষিজমি নদী বা রাস্তার দুদিকে বিস্তৃত থাকে। অনুরূপভাবে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে যে চৌমাথার সৃষ্টি হয়, সেখানে দুটি রৈখিক গ্রামের সংযুক্তির ফলে একটি চৌমাথা গ্রামের (crossroad village) সৃষ্টি হয় (চিত্র—১৬ গ)। আবার শুষ্ক অঞ্চলে কোন নির্ঝর বা কূপকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে

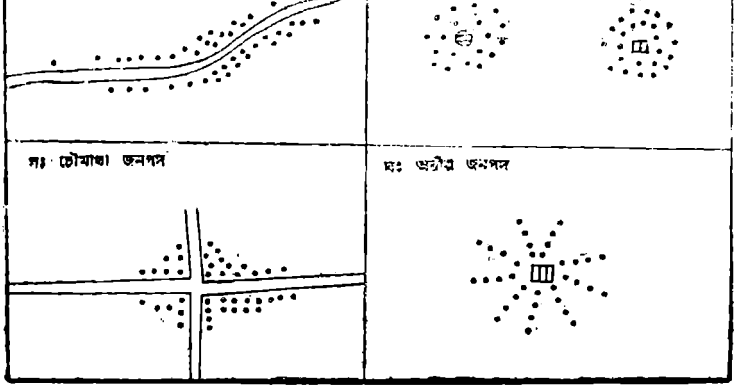

চিত্র—১৬ : বিশেষ ধরনের পুঞ্জীভূত জনপদ

যে গ্রাম গড়ে উঠে, তাকে বৃত্তাকার বা বলয়াকার গ্রাম বলে (চিত্র—১৬ খ)। প্রাচীনকালে এ জাতীয় গ্রাম অনেক সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দেয়াল দ্বারা

www.pathagar.com

বেষ্টিত করা হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃত্তাকার গ্রামের কেন্দ্র থেকে অরীয় ধরনে (radially) গৃহসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে (চিত্র—১৬ ঘ)

পুঞ্জীভূত গ্রামের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কৃষি উপযোগী জমি যেখানে প্রাকৃতিক কারণে সর্বব্যাপী নয়, সেরূপ অঞ্চলে গ্রাম পুঞ্জীভূতভাবে সৃষ্ট হয়। তবে পুঞ্জীভূত গ্রামের উৎপত্তির প্রধান ঐতিহাসিক কারণ প্রতিরক্ষামূলক, অর্থাৎ বহিঃআক্রমণ হতে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অতীতে বিভিন্ন, সমাজ সংঘবদ্ধভাবে এক স্থানে বসবাস করার চেষ্টা করেছে এবং তার ফলে পুঞ্জীভূত গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। আধুনিককালে প্রতিরক্ষার প্রশ্নটি হয়ত আর তত বেশী প্রযোজ্য নয়, কিন্তু দলগতভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য গ্রামের প্যাটার্ন নির্ণয়ে মানুষের সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এশিয়ার পূর্বাঞ্চল (চীন ও জাপান), আফ্রিকার যে সকল অঞ্চলে সনাতনী সম্প্রদায়গত (communal) ভূমিব্যবস্থার প্রচলন আছে, ইউরোপের হাঙ্গেরী ও সংলগ্ন এলাকা, দক্ষিণ এশিয়ার ঘন বসতি অঞ্চল, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পুঞ্জীভূত গ্রামের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিক্ষিপ্ত জনপদ

যে গ্রামে গৃহসমূহ একই স্থানে পুঞ্জীভূত না হয়ে বিরাট এলাকা জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে নির্মিত হয়, তাকে বিক্ষিপ্ত গ্রাম বলে (চিত্র—১৭)। এখানে প্রতিটি গৃহে হয়ত একটিমাত্র পরিবার থাকে এবং গৃহের পাশে তার শস্যাগার ও পশু আশ্রয়স্থল নির্মিত হয়। বিক্ষিপ্ত গ্রামে সাধারণত প্রত্যেক গ্রামবাসীর কৃষিজমি তার গৃহের নিকটেই অবস্থিত থাকে এবং পুঞ্জীভূতভাবে বসবাস না করায় কোন গোষ্ঠীগত জীবনধারার সূচনা হয় না। বিক্ষিপ্ত গ্রামের উৎপত্তিতেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব পাওয়া যায়। পাহাড়ী অঞ্চল বা যে সকল অঞ্চলে জমি সাধারণত উর্বর ও পানির প্রাচুর্য রয়েছে, সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে গৃহ নির্মিত হয়। আবার নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পূর্ববর্তী পুঞ্জীভূত গ্রাম ক্ষয় হয়ে বিক্ষিপ্ত রূপ নেয়। তাছাড়া যে সকল জনবিরল অঞ্চলে নূতন বসতি স্থাপিত হয়, সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে গৃহনির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। পশ্চিম ও

www.pathagar.com

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানত বিক্ষিপ্ত গ্রামের নমুনা পাওয়া যায়।

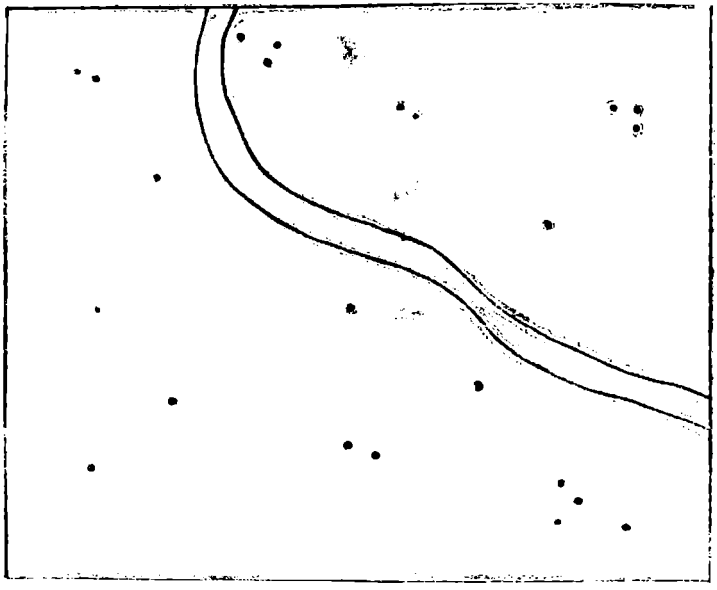

চিত্র—১৭ঃ বিক্ষিপ্ত জনপদ

বসতবাটী (Dwellings)

খাদ্য ও বস্ত্রের পর আবাস বা বসত মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। শীতপ্রধান বা উষ্ণ অঞ্চল, মরুভূমি বা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল পৃথিবীর সকল প্রকার পরিবেশে মানুষ নিজস্ব আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে। এই গৃহ তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্র। কেবলমাত্র বৃষ্টি, ঝড় বা শীত হতেই মানুষ তার বসতবাটীতে আশ্রয় নেয় না, বরং সেখানে সে একান্তে বসবাস করা, তার সম্পদ সঞ্চিত করা এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুযোগ পায়। সাংস্কৃতিক ভূগোলের সাথে মানুষের বসতবাটী বা গৃহ নমুনার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটি গৃহ ঐ অঞ্চল ও সেখানে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় বহন করে। গৃহের আকৃতি ও ডিজাইন, গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এবং গৃহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদি যৌথভাবে সাংস্কৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। নগরীয় জনপদের তুলনায়

www.pathagar.com

গ্রামীণ জনপদে বসতবাটীর চারিত্রিক বৈচিত্র্য অধিক, সুতরাং এখানে গৃহ সম্পর্কে আলোচনা গ্রামীণ জনপদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের আদিমতম বসত ছিল গিরিগুহা (cave)। ধীরে ধীরে মানুষের আবাসস্থল নানা ধরনের রূপ ধারণ করেছে এবং বর্তমানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৃহ নমুনার সীমাহীন বৈচিত্র্য দেখতে পাই। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ এই বৈচিত্র্য চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে থাকেন ঃ গৃহের আকৃতি, গৃহের ব্যবহার, গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম এবং গৃহসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান (spacing)।

গৃহের আকৃতি বলতে গৃহের নকসা, জ্যামিতিক আকার, ছাদের ডিজাইন, গৃহের উচ্চতা ইত্যাদি বুঝায়। পৃথিবীতে যে অসংখ্য নমুনার গৃহ আকৃতি দেখা যায়, মূলতঃ তা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বস্তুগত প্রতিফলন। অবশ্য ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং গৃহনির্মাণের উপাদান বা সরঞ্জাম অনেকক্ষেত্রে গৃহের আকৃতিকে প্রভাবিত করে।

গৃহের ব্যবহার অর্থাৎ যে কাজে গৃহ ব্যবহৃত হয়, নির্ভর করে ঐ গৃহে বসবাসকারী মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপর। প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া গৃহের প্রথম ও আদি ব্যবহার। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে গৃহের আরও নানাবিধ ব্যবহার ও উপযোগিতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহের অভ্যন্তরে মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশু ও পশুখাদ্য আশ্রয় পায়। আবার গৃহের একটি অংশ শস্যাগার রূপেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া গৃহের বিভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন ব্যবহার, যেমন, রন্ধন, শয়ন, স্নান, অভ্যর্থনা ইত্যাদি বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে আবাসিক গৃহের একটি অংশ অনেক সময় দোকান বা ছোট কারখানারূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং, গৃহের ব্যবহার বা উপযোগিতার অসংখ্য বৈচিত্র্য পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে দেখা যায়।

স্থানীয়ভাবে গৃহনির্মাণের কাঁচামালের লভ্যতা, জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি যৌথভাবে একটি অঞ্চলের গৃহনির্মাণের সরঞ্জামে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। শীতপ্রধান অঞ্চল ও উষ্ণ অঞ্চলে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ভিন্নতর হয় কারণ প্রথমোক্ত অঞ্চলে প্রয়োজন হচ্ছে গৃহের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে উষ্ণতা সঞ্চয় করে রাখা, কিন্তু শেষোক্ত অঞ্চলে বাইরের উষ্ণতা অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য। অনুরূপভাবে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে অপ্রবেশ্য উপাদান দ্বারা ছাদ নির্মাণ করা হয়, কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে সে প্রকার প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

গৃহনির্মাণের অন্যতম বহুল প্রচলিত সরঞ্জাম কাঠ। অতীতকালে কেবল মাত্র অরণ্যাঞ্চলে কাঠের গৃহ তৈরী হ'ত, কারণ সেখানে এই মাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে অরণ্যাঞ্চলের বাইরেও গৃহনির্মাণের প্রধান উপাদানরূপে কাঠ ব্যবহৃত হয়। উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহ, উত্তর সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জন্য কাঠের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বলাবাহুল্য যে, এ সকল অঞ্চলের নিকট অরণ্যাঞ্চল বিস্তৃত রয়েছে যেখান থেকে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। কাঠ ব্যবহার করে দু প্রকার গৃহনির্মাণ করা যায়: গাছের গুঁড়িগৃহ (log house) এবং ফ্রেমগৃহ (frame house)। গৃহনির্মাণে গাছের গুঁড়ির ব্যবহার সম্ভবত উত্তর ইউরোপে সূচিত হয় এবং উত্তর আমেরিকায় প্রথম পর্যায়ের ইউরোপীয় বাসিন্দারা এ প্রকার গৃহনির্মাণ ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করে। উত্তর গোলার্ধের অরণ্যাঞ্চলে এখনো গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করে গৃহনির্মাণ করা হয়; অবশ্য পূর্ব অপেক্ষা এর জনপ্রিয়তা এখন অনেক কমে গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, গাছের গুঁড়ি দ্বারা গৃহনির্মাণ সাধারণত অজটিল এবং কেবলমাত্র একটি কুঠার দ্বারাই সকল কাজ সমাধা করা যায়। কাঠের বোর্ড বা তক্তা ব্যবহার করে যে গৃহ নির্মিত হয়, তাকে ফ্রেমগৃহ বলে। বর্তমানে গুঁড়িগৃহ অপেক্ষা এ প্রকার গৃহ অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কাঠের একটি ফ্রেম নির্মাণ করে তাতে কাঠের বোর্ড বা তক্তা দ্বারা দেয়াল ও ছাদ জুড়ে দিয়ে ফ্রেমগৃহ তৈরী করা হয়। গুঁড়িগৃহ অপেক্ষা ফ্রেমগৃহ নির্মাণ জটিলতর, তবে ফ্রেমগৃহ ডিজাইন ও আকৃতির দিক দিয়ে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ফ্রেমগৃহের ব্যাপক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

গৃহনির্মাণে অপর এক বহুল প্রচলিত উপাদান কাদামাটি। কাদামাটিকে ইটের ছাঁচে ফেলে ব্লক তৈরী করে রোদে শুকানো হয় এবং এই রোদে পোড়া ইট দ্বারা দেয়াল নির্মাণ করা হয়। সিক্ত কাদা দ্বারা সেখানে গাঁথুনী

www.pathagar.com

ও প্রলেপ দেওয়া হয়। ছাদ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন উপাদান, যেমন—টালি (tile) খড় পাতা বা টিন ব্যবহৃত হয়। রোদে-পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত গৃহকে "এ্যাদোবি" (adobe) গৃহ বলে। বনসম্পদ কম এমন অঞ্চলে "এ্যাদোবি" গৃহের বিস্তৃতি দেখা যায়। শুষ্ক ও আর্দ্র—উভয় প্রকার জলবায়ুতেই এ জাতীয় গৃহ নির্মিত হয়, তবে বৃষ্টিবহুল এলাকায় দেয়ালে মোটা প্রলেপ দেওয়া হয় এবং অধিক যত্নসহকারে ছাদ নির্মাণ করা হয়।

যে পরিবেশে কাদামাটি সহজে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রস্তর খণ্ডের প্রাচুর্য রয়েছে, সেখানে প্রস্তর বা শিলানির্মিত গৃহ (stone house) দেখা যায়। চুনাপাথর ও বেলেপাথর শিলাগৃহ নির্মাণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সমাজে শিলাগৃহ নির্মাণে সিমেন্টের দ্বারা শিলাখণ্ডসমূহ একের পর এক সাজিয়ে দেয়াল তোলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিমেন্ট ছাড়া কেবলমাত্র শিলাখণ্ড পর পর স্থাপন করে গৃহ নির্মিত হয় এবং তার উপর খড়ের ছাউনী দেওয়া হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের বসতিসমূহে প্রস্তর বা শিলা গৃহনির্মাণের একমাত্র সরঞ্জাম।

ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে গৃহনির্মাণে বাঁশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গৃহের খুঁটির জন্য বাঁশের ব্যবহার ছাড়াও বাঁশের ফালি একত্রে বিজড়িত করে দেয়াল নির্মাণ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ দেয়ালে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে অধিকতর টেকসই বানানো হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ নিজ সুবিধার্থে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে গৃহ নির্মাণ করেছে।

সবশেষে, গৃহসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান (spacing) গ্রামীণ জনপদের প্যাটার্ন নির্দেশ করে। আপেক্ষিক অবস্থান বলতে গৃহসমূহের পারিসরিক বিন্যাস বুঝায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল গৃহ যদি পরস্পরের সাথে সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন সেই প্যাটার্নকে পুঞ্জীভূত বলা হয় এবং এই পুঞ্জীভূত প্যাটার্ন রৈখিক, বৃত্তাকার বা ঘনবিন্যস্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, গৃহসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত থাকলে তাকে বিক্ষিপ্ত প্যাটার্ন বলা হয়। এই দুই প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারণ উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জনপদ ঃ নগরীয়

আধুনিক যুগ নগরায়নের যুগ। বস্তুতপক্ষে, নগরায়ন সভ্যতার ন্যায়ই প্রাচীন। বর্তমান পৃথিবীতে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় প্রকার সংস্কৃতিতে নগরায়ন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রামীণ জনপদসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ও চারিত্রিক পরিবর্তনের ফলে ঐ সকল জনপদ নগরীয় জনপদে রূপান্তরিত হচ্ছে; আবার গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক পরিমাণের ফলে নগরীয় জনপদগুলির জনসংখ্যা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নগরীয় জনপদ প্রায় পাঁচ হাজার বছর থেকে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের অধিকাংশ সময় নগরীয় জনপদগুলি ক্ষুদ্র ও স্বল্প সংখ্যক ছিল এবং মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ শহরে বসবাস করত। গত দু' শতাব্দীতে এ ধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং নগরীয় জনপদের সংখ্যা ও জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পৃথিবীর মাত্র দুই শতাংশ লোক শহরে বাস করত। এ শতাব্দীর শুরুতে ঐ সংখ্যা দশ শতাংশে বৃদ্ধি পায় এবং সংখ্যাতাত্ত্বিকদের হিসাব অনুসারে ২০০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক শহরে বাস করবে বলে ধারণা করা হয়। নগরীয় জনপদের ন্যূনতম সংখ্যা কত হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মাপকাঠিতে কোন মতৈক্য নেই। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ লোক শহরের অধিবাসী বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য এই সংখ্যা বাস্তব অবস্থার সঠিক রূপায়ণ করে না, কারণ নগরীয় জনসংখ্যার অনুপাত কোথাও অনেক বেশী ও কোথাও খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ৮০ জনের অধিক লোকসংখ্যা শহরের অধিবাসী; যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, হল্যাণ্ড, জাপান ও ভেনেজুয়েলায় ৭০ শতাংশের বেশী লোক নগরীয় জনপদে বাস করে; এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রীস, মেক্সিকো ও কলম্বিয়ায় নগরীয় জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ। অপরদিকে, আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ

www.pathagar.com

জনসংখ্যা গ্রামীণ এবং অনেক ক্ষেত্রে নগরীয় জনপদে শতকরা ১৫ ভাগেরও কম লোক বাস করে। ১৯৭৪ এর লোক গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা মাত্র নয় জন নগরীয় জনপদের অধিবাসী।

নগর মানব সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। যুগে যুগে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নগরীয় জনপদের চরিত্র ও ধারা রূপান্তরিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে নগরীয় জনপদের স্থানিক বৈশিষ্ট্য, গঠন, ব্যবহার এবং পারিসরিক বিন্যাস পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্থানিক প্রকৃতি ও অবস্থানস্থল (Site and Situation)

স্থানিক প্রকৃতি (site) নগর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামক। যে ভূমির উপর শহর নির্মিত বা স্থাপিত হয়, সেই ভূমির প্রকৃত প্রাকৃতিক চরিত্রকে স্থানিক প্রকৃতি বলে, যেমন—একটি দ্বীপ, পাহাড়ের টিলা, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা বা নদীবাঁক ইত্যাদি। প্রাচীন কালে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পাহাড়ের টিলা বা পানি পরিবেষ্টিত দ্বীপ শহর স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হ'ত। গ্রীসের রাজধানী এথেন্‌স্ প্রথমত নিরাপত্তার জন্য একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়; অনুরূপভাবে ইটালীর ভেনিস শহর দস্যুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টিতে স্থাপিত হয়। বলাবাহুল্য যে, প্রায় প্রতিটি শহর বা নগর আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার স্থানিক প্রকৃতির আদি উপযোগিতা হারিয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে নগর সম্প্রসারণে বাধারও সৃষ্টি করে।

নগর উন্নয়ন ও নগরীয় চরিত্র উপলব্ধির জন্য স্থানিক প্রকৃতি অপেক্ষা নগরের অবস্থানস্থলের (situation) গুরুত্ব অধিক। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে পটভূমিতে একটি নগরের অবস্থানকে অবস্থানস্থল বলে; যেমন দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে কোন শহর গড়ে উঠলে ঐ নদীদ্বয়ের পরিবহণ সুবিধাদি ও সংলগ্ন এলাকার উৎপাদন ক্ষমতা সেই শহরের অবস্থানস্থলরূপে গণ্য হবে। ভূমধ্য-সাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশে এথেন্‌সের অবস্থানস্থল ঐ নগরের বিকাশে সহায়তা করেছে। একইভাবে এড্রিয়াটিক সাগরের মাথায় অবস্থিত ভেনিসের অবস্থানস্থল মহাদেশীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের যোগসূত্রে স্থাপন করে। শহরের স্থানিক প্রকৃতি মোটামুটি অপরিবর্তিত

www.pathagar.com

থাকলেও অবস্থানস্থলের গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরিবহণ ব্যবস্থা, উৎপাদন ক্ষমতা, কৃষিব্যবস্থা তথা সাধারণ আঞ্চলিক কাঠামোর পরিবর্তনের দরুন একটি শহরের অবস্থান স্থল ও তার চরিত্র ব্যাপক হারে রূপান্তরিত হতে পারে।

নগরীয় তৎপরতা (Urban functions)

গ্রামীণ জনপদ মূলতঃ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। কিন্তু নগরীয় জনপদে বহুবিধ তৎপরতা দেখা যায়। নগরের এই বহুমখী রূপ নগরকে গ্রাম থেকে পৃথক করেছে। একটি শহর তার নিজ অধিবাসীর জন্য বিভিন্ন সার্ভিস (service) প্রদান করা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য সার্ভিস প্রদান করে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক শহরের একাধিক তৎপরতা থাকে এবং যে শহর যত বড়, তার সার্ভিস তৎপরতা তত বেশী। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি শহরে কোন একটি তৎপরতা বেশী প্রাধান্য পায় এবং সেই তৎপরতা বা কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে ঐ শহরের পরিচয় দেওয়া হয়। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ডেট্রয়টকে একটি শিল্প নগর (মোটর গাড়ী কারখানার জন্য); হংকংকে একটি বাণিজ্য নগর ও বন্দর; মক্কাকে একটি ধর্মীয় নগররূপে অভিহিত করা হয়, কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কর্মকাণ্ড (যথাক্রমে মোটর শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্মীয় তৎপরতা) অপর সকল কর্মকাণ্ড অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কর্ম তৎপরতার ভিত্তিতে ভূগোলবিদগণ নগরীয় জনপদের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। একটি শহরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমসংখ্যার ভিত্তিতে আমেরিকান ভূগোলবিদ হ্যারিস (Harris) নগরীয় জনপদের এক ব্যবহারিক শ্রেণীবিন্যাস উপস্থাপন করেছেন। হ্যারিস প্রদত্ত পরিকল্পে, মোট নয় প্রকার নগরীয় জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) শিল্প নগর: এখানে ব্যবসা ও শিল্প কাজে নিয়োজিত শ্রমসংখ্যার ৬০ শতাংশ কেবলমাত্র শিল্প ও কলকারখানায় কর্মরত; (২) খুচরা ব্যবসা নগর: ব্যবসা ও শিল্প শ্রমসংখ্যার ৫০ শতাংশ খুচরা ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োজিত; (৩) পাইকারী ব্যবসা নগর: এখানে পাইকারী ব্যবসা অন্য সকল কর্মকাণ্ডের তুলনায় অধিক উল্লেখযোগ্য; (৪) পরিবহণ নগর; ১১ শতাংশ শ্রমসংখ্যা

www.pathagar.com

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে নিয়োজিত ; (৫) বৈচিত্র্যপূর্ণ নগর ; এখানে কোন একটি কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য লাভ করে নাই ; (৬) শিক্ষা নগর ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৎসংশ্লিষ্ট তৎপরতা এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য ; (৭) বিনোদন নগর : অধিকাংশ অধিবাসী বিনোদনমূলক কর্ম তৎপরতার ও সার্ভিসের সাথে জড়িত ; (৮) খনিজ নগর ; এখানে ১৫ শতাংশ শ্রমজীবী খনিজ শিল্পে নিযোজিত ; এবং (৯) প্রশাসনিক নগর ; রাজধানী বা অনুরূপ প্রশাসনিক দপ্তরের পরিচয়ে এ সকল জনপদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, হ্যারিস তাঁর শ্রেণীবিভাজনে শ্রমসংখ্যার যে সকল ন্যূনতম মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, তা বিতর্কসাপেক্ষ এবং অনেকেই তাঁর শ্রেণীবিন্যাসকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু প্রত্যেক নগরীয় জনপদ একাধিক তৎপরতা সম্পাদন করে, সেজন্য হ্যারিসের পরিকল্প অনুযায়ী শ্রমসংখ্যার ভিত্তিতে কেবল একটি তৎপরতার সাথে জড়িত করলে তার বহুমুখী চরিত্রের প্রকৃত প্রতিফলন হয় না। আরেকজন আমেরিকান ভূগোলবিদ নেলসন (Nelson) শ্রমসংখ্যার একটি সামগ্রিক প্যাটার্নের সাথে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমসংখ্যার তুলনার মাধ্যমে হ্যারিস অপেক্ষা একটি জটিল ফরমুলা দ্বারা নগরীয় জনপদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নগরের বহুমুখিতার প্রকৃত প্রকাশ।

নগরের আভ্যন্তরীণ গঠন

কোন শহরই ঘরবাড়ী ও অট্টালিকার বিশৃঙ্খল একটি সমষ্টি নয় : বরং প্রত্যেক শহরে একটি গাঠনিক শৃঙ্খলা পাওয়া যায়। শহরের অভ্যন্তরে ব্যবসা বাণিজ্য, বাসস্থান, উৎপাদন, শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ তৎপরতা ও ব্যবহারের একটি পারিসরিক বিন্যাস দেখা যায় ; অর্থাৎ এককথায় শহরের বিভিন্ন অংশকে বাণিজ্যিক আবাসিক বা প্রশাসনিক এলাকা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং, শহরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন তৎপরতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল গড়ে উঠে। এ সকল অঞ্চল একে অন্যের পাশাপাশি অবস্থিত এবং সকল অঞ্চলের সমষ্টিতে গোটা শহরটি সৃষ্টি হয়।

নগরীয় অঞ্চলসমূহের গাঠনিক বিন্যাস সম্পর্কে ভূগোলবিদগণ অনেক গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন শহরের অভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষার পর একটি

www.pathagar.com

মোটামুটি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত হচ্ছে কেন্দ্র অঞ্চল (central zone)। কেন্দ্র অঞ্চল শহরের প্রাণ-কেন্দ্র এবং এর মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল "কেন্দ্রীয় ব্যবসা এলাকা" বা central business district। কেন্দ্র অঞ্চলে খুচরা ও পাইকারী দোকান, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিস, হোটেল, থিয়েটার, রেল স্টেশন ও বাস টারমিনাল এবং নিম্নবিত্ত জনসাধারণের আবাসিক এলাকা দেখা যায়। কেন্দ্র অঞ্চলকে বলয়াকারে পরিবেষ্টিত করে থাকে মধ্যাঞ্চল (middle zone)। মধ্যাঞ্চল একটি মিশ্র এলাকা এবং এখানে বিবিধ কর্মকাণ্ডের নমুনা পাওয়া যায়। কেন্দ্র অঞ্চলের সম্প্রসারণে মধ্যাঞ্চলে প্রায়ই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং এই অস্থিতিশীল অবস্থার জন্য সেখানে অবনতিশীল গৃহ ও বিজ্ঞি অস্বাস্থ্যকর আবাসিক পরিবেশ একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। মধ্যাঞ্চলের বাইরে বহিরাঞ্চল (outer zone) অবস্থিত। এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য উচ্চবিত্ত অধিবাসীর আবাসিক এলাকা, উন্নতমানের ব্যবসা কেন্দ্র, বিনোদন-মূলক পার্ক ইত্যাদি। শহর প্রান্তে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চলও গড়ে উঠে। নগরীর অভ্যন্তরীণ গঠনের উপরোক্ত প্যাটার্ন একটি আদর্শ চিত্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ সমকেন্দ্রিক বলয়াকারে সৃষ্টি হয়েছে বলে এতে ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন শহরে এই আদর্শ প্যাটার্নের ব্যতিক্রম দেখা যাবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এর সাধারণ চরিত্র অবিকৃত থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক শহরের কেন্দ্রস্থলে মূল বাণিজ্যিক এলাকা, শহরের প্রান্তে উন্নতমানের আবাসিক এলাকা এবং মধ্যাঞ্চলে একটি মিশ্র এলাকার পরিচয় পাওয়া যায়।

পারিসরিক বিন্যাস

একটি নগরীয় জনপদ তার চতুষ্পার্শ্বে এলাকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে—বস্তুতপক্ষে এই এলাকাটি ঐ নগরের পশ্চাদ্‌ভূমি। নগরটি কেন্দ্রীয় স্থলে অবস্থিত হয়ে পশ্চাদ্‌ভূমিকে বিভিন্ন পণ্য ও সার্ভিস সরবরাহ করে। ঐ অর্থে প্রতিটি নগরী একটি "কেন্দ্রস্থল" বা central place ; এমনকি একটি গ্রামীণ জনপদও তার চতুষ্পার্শ্বের ক্ষুদ্র পশ্চাদভূমির কেন্দ্রস্থল হতে পারে। জনপদসমূহ কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হলে তাদের জনসংখ্যা ও তৎপরতার মাত্রা অনুসারে তাদের পারিসরিক বিন্যাসে এক সুষম প্যাটার্ন আশা করা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যায়। জার্মান ভূগোলবিদ ক্রিস্টালার (Christaller) ১৯৩৩ সালে তাঁর বিখ্যাত কেন্দ্রস্থল তত্ত্বের (central place theory) মাধ্যমে এই বিন্যাস সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই তত্ত্ব জার্মানীর পটভূমিতে পরীক্ষা করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। ক্রিস্টালার তাঁর তত্ত্বে একটি সমরূপী ও বৈচিত্র্যহীন ভূমি কল্পনা করেছেন এবং এই সমভূমিতে সকল জনপদ সমদূরত্বে অবস্থিত হবে। প্রত্যেক জনপদের একটি নিজস্ব সার্ভিস অঞ্চল থাকবে এবং ঐ জনপদটি সার্ভিস অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল। সার্ভিস অঞ্চলসমূহের আকার বৃত্তের ন্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পাশাপাশি অবস্থিত বৃত্ত যেহেতু কখনো খাপ খাওয়ানো যায় না, তাই ক্রিস্টালার এই সার্ভিস অঞ্চলের আকার ষড়ভুজের ন্যায় কল্পনা করেছেন।

কোন অঞ্চলের সকল জনপদ একই মানের অর্থাৎ সমপরিমাণ জনসংখ্যার হয় না। ক্ষুদ্র জনপদ সামান্য কয়েকটি সার্ভিস পরিবেশন করে এবং তার সার্ভিস অঞ্চলও ছোট হয়ে থাকে। অন্যদিকে একটি বৃহৎ জনপদ অনেক প্রকার পণ্য ও সার্ভিস পরিবেশন করে, সুতরাং তার সার্ভিস অঞ্চল বেশ বড় হয় এবং ক্ষুদ্র জনপদের সার্ভিস অঞ্চলসমূহ ঐ সার্ভিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রিস্টালার কেন্দ্রস্থলসমূহের এই আনুক্রমিক ধারাকে (hierarchical pattern) জার্মানী থেকে দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে ক্ষুদ্র জনপদের সংখ্যা বেশী থাকবে এবং ঐ সকল জনপদ বেশ কাছাকাছি অবস্থিত হবে; কিন্তু বৃহৎ জনপদসমূহ সংখ্যায় কম এবং দূরে দূরে অবস্থিত হবে। এভাবে প্রত্যেক অঞ্চলে জনপদের একটি আনুক্রমিক প্যাটার্ন প্রকাশ পাবে। এই অনুক্রমে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে প্রতি উচ্চতর পর্যায়ের কেন্দ্রস্থল তার নিম্নতর পর্যায়ের জনপদের সার্ভিসসমূহ সরবরাহ করবে এবং উপরন্তু কিছু নুতন সার্ভিসেও সেখানে পাওয়া যাবে। এভাবে নিম্নতর পর্যায়ের সার্ভিস অঞ্চলসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের সার্ভিস অঞ্চলের অভ্যন্তরে সংকলিত হয়। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের কেন্দ্রস্থল তার নিজস্ব পণ্য ও সার্ভিস সরবরাহ ছাড়াও নিম্নতর পর্যায়ের সকল সার্ভিসের সুযোগ সেখানে থাকবে।

ক্রিস্টালারের কেন্দ্রস্থল তত্ত্ব নিখুঁতভাবে সকল পরিবেশে প্রযোজ্য হবে এমন আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাস্তবক্ষেত্রে কোন সার্ভিস অঞ্চল বিশুদ্ধ

ষড়ভূজাকার হয় না। পরিবহণ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রায়ই সার্ভিস অঞ্চলের আকার প্রভাবিত করে। কিন্তু ক্রিস্টালারের প্রস্তাবিত জনপদের প্রতিসম (symmetrical) বিস্তারণ বাস্তবে না পাওয়া গেলেও তাঁর মডেল সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে নগরীয় জনপদের পারিসরিক বিন্যাসে পণ্য ও সার্ভিস সরবরাহ এবং জনপদের লোকসংখ্যার এক আনুক্রমিক প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক জগৎ

মানবসৃষ্ট সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। সংস্কৃতির অগণিত বৈশিষ্ট্য ঐ ভূদৃশ্য গঠনে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সংস্কৃতির পারিসরিক প্রতিফলনের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে কয়েকটি সমরূপী সাংস্কৃতিক জগতে (culture realms) বিভক্ত করা যায়। বর্তমান যুগে মানবজাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠে সাংস্কৃতিক জগৎসমূহ মোটামুটি স্পষ্ট-ভাবে চিহ্নিত করা যায়। সাংস্কৃতিক জগৎ ভূপৃষ্ঠের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণসমূহে সমরূপতা (uniformity) দেখা যায়। এই সমরূপতা এক সাংস্কৃতিক জগৎকে অপর সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে পৃথক করে। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক জগতের অভ্যন্তরে ছোট ছোট বহু বিভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি বাদ দিয়ে ঐ অঞ্চলের সার্বিক সমরূপতায় সাংস্কৃতিক জগতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক জগৎ কি ভিত্তিতে নির্দেশিত হবে এবং তার সীমা নির্ধারণ কিভাবে করা যাবে. সে সম্পর্কে কোন মতৈক্য দেখা যায় না। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে সাংস্কৃতিক জগৎ নিরূপণে সেখানকার ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক তথ্যাদি পরীক্ষা করতে হবে; এবং সাংস্কৃতিক তথ্যাদিতে কেবলমাত্র ভাষা বা ধর্মই বুঝায় না, বরং অর্থনীতি ও রাজনীতিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ভিত্তিতে যেমন সারা পৃথিবীকে জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, সেরূপ কোন এক বা একাধিক সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণকে বিশ্বজনীন ভিত্তিস্বরূপ প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক জগৎ গঠন করা সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ ঐ অঞ্চলে সমরূপতা অর্জন করতে সাহায্য করে এবং সুতরাং কোন একটি সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ বিশ্বজনীন নির্ণায়ক (criterion) রূপে প্রযোজ্য হতে পারে না। সাংস্কৃতিক জগতের সীমা নির্ধারণ আর একটি জটিল সমস্যা, কারণ সংস্কৃতি কখনো বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। প্রায়

www.pathagar.com

প্রত্যেক সংস্কৃতি তার প্রতিবেশী সংস্কৃতির সাথে অতি সূক্ষ্মভাবে মিশে যায় এবং সেজন্য মানচিত্রে একটি রেখা দ্বারা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সীমা নির্ধারিত করা হ'লেও বাস্তবে ঐ সীমা একটি পরিবর্তনকালীন (transitional) অঞ্চল।

বিভিন্ন লেখক পৃথিবীকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে আছেন নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ। কিন্তু এঁরা সবাই তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিক জগৎ নির্ধারণ করেছেন; সুতরাং সাংস্কৃতিক ভূগোলে ঐ সকল সাংস্কৃতিক জগৎ বেশী অর্থপূর্ণ হয়নি। আধুনিককালে বেশ কয়েকজন ভূগোলবিদ পৃথিবীকে সাংস্কৃতিক জগতে বিভক্তি-করণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সবাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নির্ণায়ক প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক জগৎ রচনা করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পরীক্ষা করলে তাঁদের পরিকল্পে (scheme) বেশ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন মৌলিক অনৈক্য নেই। বস্তুতপক্ষে, ঐ সকল পরিকল্পে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের সীমারেখা সম্পর্কে এক সাধারণ মতৈক্য দেখা যায়। একাধিক সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ বিভিন্ন স্থানে বৈষম্যমূলক (differential) গুরুত্ব সহকারে নির্ণায়করূপে প্রয়োগ করে নিম্নে সাংস্কৃতিক জগতের একটি পরিকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্র—১৮এ দেখানো এই বারটি সাংস্কৃতিক জগৎ হচ্ছে :

(১) ইসলামী
(২) ইউরোপীয়
(৩) দক্ষিণ এশীয়
(৪) চীনা
(৫) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়
(৬) আফ্রিকান
(৭) ল্যাটিন আমেরিকান
(৮) অ্যাংলো আমেরিকান
(৯) অস্ট্রেলীয়
(১০) সোভিয়েট
(১১) জাপানী
(১২) প্রশান্ত মহাসাগরীয়

www.pathagar.com

চিত্র—১৮ঃ সাংস্কৃতিক জগৎ

www.pathagar.com

ইসলামী জগৎ (১)

এই সাংস্কৃতিক জগৎ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা হ'তে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেকে এই অঞ্চলকে আরব জগৎ বা মরু জগৎ নামেও আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু তাতে এই অঞ্চলের অধিবাসীর প্রকৃত সত্তা প্রকাশ পায় না। এই অঞ্চলের মধ্যে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম জন্ম নেয়, কিন্তু বর্তমানে ইসলাম এখানে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ধর্ম। ইসলাম ধর্ম একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা রচনা করে এবং সেজন্য এ অঞ্চলে ভাষা ও বর্ণগোষ্ঠীর বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের ব্যাপ্তিশীল প্রভাব এখানকার সকল দেশে অনুভূত হয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, ইসলামী জগতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং মরু অঞ্চলের পৃথকীকৃত ও বিচ্ছিন্ন মানব-গোষ্ঠীসমূহ অনেক ক্ষেত্রে উপ-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। এরূপ কয়েকটি অঞ্চল হচ্ছে যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার "মাগরেব", পশ্চিম এশিয়ার তথাকথিত "মধ্যপ্রাচ্য", উত্তর আফ্রিকার আরব ও নিগ্রো সংমিশ্রণ এলাকা এবং আরবী-ভাষী নয় এমন দেশসমূহ, যেমন তুরস্ক ও ইরান।

অধুনিককালে ইসলামী সাংস্কৃতিক জগতে গ্রামীণ দারিদ্র্য, রক্ষণশীল ঐতিহ্য-বাদিতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিতিশীলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য যে এই অঞ্চলে পৃথিবীর দু'টি প্রাচীন সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল এবং বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামী সাংস্কৃতিক জগতে তেল সম্পদ আবিষ্কারের পর সেখানে সমৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের সূচনা হয়। এই জগতের মধ্যে প্রচুর অসমতা ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও ইসলাম ধর্ম তাদের মাঝে একতাবোধ আনতে প্রধান শক্তির কাজ করে।

ইউরোপীয় জগৎ (২)

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ নিয়ে এই সাংস্কৃতিক জগৎ গঠন করা হয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হ'লেও এই জগৎ বেশ জনবহুল। ইউরোপে আধুনিক কালের বহু বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ঘটেছে যা বর্তমান পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে এবং এই সাংস্কৃতিক জগৎ অনেক ক্ষেত্রেই মানবজাতির প্রগতিতে নেতৃত্ব দান করেছে। ইউরোপীয় জগতের অভ্যন্তরে অনেক প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, যেমন, ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণ উপকূল থেকে শীতপ্রধান স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা উত্তর

www.pathagar.com

সাগরের নিম্ন উপকূল থেকে বরফাবৃত আল্পস পর্বত। ভাষার দিক দিয়েও এই অঞ্চলে কোন সমরূপতা নেই। কিন্তু যে সকল বৈশিষ্ট্য এই জগতে সুস্পষ্ট সমরূপতা এনে দিয়েছে সেগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রগতি, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নত ও ব্যাপক পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন এবং নগরায়ন।

দক্ষিণ এশীয় জগৎ (৩)

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ একটি অন্যতম জনাকীর্ণ সাংস্কৃতিক জগৎ। পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ এই অঞ্চলে বাস করে। এই অঞ্চল অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার উৎসস্থল এবং বহুকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর এখানে চারটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়ঃ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাচীনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয়; পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম এখানে প্রবেশ করার পর নতুন সাংস্কৃতিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ভাষা-ভিত্তিক কোন সমরূপতা নেই; এই জগতে এক ডজনের অধিক ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে ভারতে হিন্দু, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ইসলাম এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং চারটি দেশের রাজনৈতিক কাঠামো বিভিন্নতর। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক ইতিহাস, জনসংখ্যা সমস্যা, সাধারণ দারিদ্র্য, গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক জীবনধারা, খাদ্যসমস্যা এবং উন্নয়ন-কামী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গোটা অঞ্চলে একতাবোধ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে এবং এর ফলস্বরূপ দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগৎরূপে বিবেচনা করা যায়।

চীনা জগৎ (৪)

চীন একটি জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগৎ। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার আবাসভূমি বর্তমান চীন এক প্রাচীন সভ্যতার আধুনিক সংস্করণ। চীনা সভ্যতা উত্তর চীনের হোয়াং হো উপত্যকায় সূচিত হয় এবং প্রায় দুই হাজার বছর বা তারও পূর্বে চীনা সভ্যতা একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এই সাংস্কৃতিক সত্তা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান

www.pathagar.com

কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং এর স্বকীয়তা চীনকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগৎরূপে চিহ্নিত করেছে। চীনের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়তে সাহায্য করেছে। পর্বত, মরুভূমি এবং অগম্য পথ চীনের প্রাচীন সভ্যতাকে পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বৈদেশিক আক্রমণকে চীনা জনগণ অতীতে হয় প্রতিহত করেছে অথবা বিশোষিত করে নিয়েছে। ইতিহাসের সকল সময় চীনা জাতি নিজকে একটি উন্নত ও স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করেছে এবং এই একতাবোধ চীনা সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম নির্ণায়ক। ভাষা ও বর্ণগোষ্ঠীর একরূপতা চীনা জগতে আরও অধিক সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জগৎ (৫)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চীন অথবা দক্ষিণ এশিয়ার ন্যায় একটি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত সাংস্কৃতিক জগৎ নয়। বলাবাহুল্য যে এ অঞ্চলে প্রচুর ভাষা ও জাতিভিত্তিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাছাড়া এখানে অতীতে একাধিক ঔপনিবেশিক শক্তি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের কয়েকটি দেশ (বার্মা, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, ভিয়েৎনাম ও মালয়েশিয়া) এবং সংলগ্ন দ্বীপমালা (ইন্দোনেশীয়, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সাংস্কৃতিক জগতের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার জনসাধারণের অধিকাংশে চীনা বংশগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় হিন্দু প্রভাবের চিহ্নও দেখা যায়। অপরদিকে ইসলাম ধর্ম এ অঞ্চলে প্রবেশের পর মুসলিম সংস্কৃতি সেখানে প্রসার লাভ করে। বর্তমানে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ভাষার বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জীবন-ধারার সমরূপতা দেখা যায়। উন্নয়নকামী কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তিতে এবং বিশ্বের পরাশক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিরূপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি স্বকীয় জগতে পরিণত হয়েছে।

আফ্রিকান জগৎ (৬)

আফ্রিকা মহাদেশে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশ কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের আবাসভূমি। এই অঞ্চলটি আফ্রিকান সাংস্কৃতিক জগৎ নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

এ জগতের উত্তরে ইসলামী জগৎ অবস্থিত, কিন্তু এ দুই জগতের সীমারেখা প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবর্তনকালীন (transitional) অঞ্চল। আফ্রিকান সাংস্কৃতিক জগতের শতাধিক ভাষাগোষ্ঠী এবং প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদী (animistic) ধর্মবিশ্বাস সে অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মের পাশাপাশি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসসমূহ এখনো প্রচলিত রয়েছে। বর্ণগোষ্ঠীর একরূপতা ব্যতীত আফ্রিকান জগৎ নির্ধারণে আরও কয়েকটি নির্ণায়ক উল্লেখ করা যায়, যেমন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, প্রাচীন পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন, জাতি ও উপজাতি ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা (tribal society) এবং সাধারণ দারিদ্র্য। এ ছাড়া বহু যুগ ধরে এ অঞ্চল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা শোষিত হওয়ায় বর্তমান যুগে আফ্রিকানদের মধ্যে এক শক্তিশালী জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ ঘটেছে এবং এই চেতনা আফ্রিকান সাংস্কৃতিক জগতে স্বকীয়তা দান করেছে।

ল্যাটিন আমেরিকান জগৎ (৭)

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের সমষ্টিতে ল্যাটিন আমেরিকান সাংস্কৃতিক জগৎ গঠিত হয়েছে। প্রাচীন আমেরিণ্ডীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করে স্পেন ও পোর্তুগালের সংস্কৃতি এখানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং সে কারণে এই সংস্কৃতিকে "ল্যাটিন" সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ব্রাজিলে ব্যবহৃত পোর্তুগীজ ভাষা ব্যতীত ল্যাটিন আমেরিকার অন্যত্র প্রায় সকল স্থানে স্প্যানীশ ভাষা প্রচলিত। আধুনিককালে ল্যাটিন আমেরিকান জগতে স্পেন ও পোর্তুগাল থেকে আনীত ভূমিব্যবস্থা, জমির মালিকানা, কর ব্যবস্থা, স্থাপত্যশিল্প, নগর পরিকল্পনা, সঙ্গীত ইত্যাদির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সকল বৈশিষ্ট্য ল্যাটিন আমেরিকাকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগতে পরিণত করেছে। অবশ্য এ অঞ্চলে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়, যেমন, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রভাব এবং দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ ও আমাজোন অঞ্চলের আদিবাসী আমেরিণ্ডীয় সংস্কৃতির উদ্‌বর্তন (survival)।

অ্যাংলো-আমেরিকান জগৎ (৮)

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সমষ্টিতে অ্যাংলো-আমেরিকান সাংস্কৃতিক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানত ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত

www.pathagar.com

জনসাধারণের বংশধররা এই অঞ্চলে বসবাস করে। অবশ্য এ অঞ্চলে ব্রিটেন ও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য প্রতিফলিত হওয়ায় এ জগৎকে অ্যাংলো-আমেরিকান নামকরণ করা হয়েছে। এই জগৎ পৃথিবীর অন্যতম শিল্পায়িত ও নগরায়িত অঞ্চল এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রাযুক্তিক উন্নয়ন এখানকার চরম বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত হ'লেও এই জগতের মানুষ একটি স্বকীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে এবং আটলান্টিকের অপর পারে অবস্থিত ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়-দের তুলনায় অ্যাংলো-আমেরিকানরা এক ভিন্ন প্রবাহে জীবনধারা রচনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র একটি বহু জাতিগত (plural) সংস্কৃতি। কানাডায়, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আফ্রিকার সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। নিঃসন্দেহে এই সাংস্কৃতিক বহু জাতিত্ব (cultural pluralism) কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাংলো-আমেরিকান জগতের অন্যতম পরিচায়ক ও বৈশিষ্ট্য।

অস্ট্রেলীয় জগৎ (৯)

ব্রিটিশ উপনিবেশরূপে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম পরিচিতি হ'লেও এ দু'টি দেশ সময়ের ব্যবধানে এক নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগৎ রচনা করেছে। ব্রিটেন থেকে দূরত্ব ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা খুব সম্ভবত এই স্বকীয়তা অর্জনে সহায়তা করেছে। অস্ট্রেলীয় জগতের অধিবাসীরা ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এবং সেখানকার অর্থনীতি মূলত পাশ্চাত্য—কিন্তু জনবহুল শিল্পায়িত ইউরোপের নমুনা অস্ট্রেলীয় জগতে দেখা যায় না। সেখানে বড় বড় প্রশস্ত নগরী, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, বড় বড় পশুখামার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অনুৎপাদী মরুভূমি ইত্যাদি এক বিশেষ জগৎ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অস্ট্রেলীয় জগতে নগরায়ন অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ লোক শহরে বাস করে। বর্ণগোষ্ঠী, ভাষা (ইংরেজী) ও ধর্মীয় সমরূপতা অস্ট্রেলীয় সাংস্কৃতিক জগতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েট জগৎ (১০)

আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং তার পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশসমূহ সোভিয়েট সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জগতের অন্তর্ভুক্ত। এই জগতের মূল নির্ণায়ক কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং গোটা অঞ্চলে রুশ আধিপত্য ও প্রভাব। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী সোভিয়েট জগতের স্বকীয়তা দানে সাহায্য করেছে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদী রুশ সমাজ পরিবর্তিত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ও শিল্পায়িত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ক্রমশ কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণের ফলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি সোভিয়েট আধিপত্যের পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। সোভিয়েট জগতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সারা অঞ্চলে সোভিয়েট রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত বা নির্দেশিত সাংস্কৃতিক ধারা এবং কম্যুনিস্ট নীতিতে গঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

জাপানী জগৎ (১১)

একটি ছোট্ট দেশ তার কতিপয় অনুপম গুণাগুণের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগৎ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। জাপান আজ অন্যতম প্রধান শিল্পায়িত দেশ এবং প্রাচ্যে অবস্থিত হয়েও জাপান পাশ্চাত্য উন্নত দেশ-সমূহের সমকক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে অতি স্বল্প সময়ে জাপান তার কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা যে প্রায় অলৌকিক পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, তা বিশ্বের সবাইকে বিস্মিত করেছে। এক শতাব্দীরও কম সময়ে জাতীয় চরিত্র রূপান্তর, দ্রুত শিল্পায়ন এবং বর্তমান পৃথিবীতে তার অর্থনৈতিক প্রভাবের জন্য জাপান একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগতের অধিকারী হয়েছে। শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের সাথে সাথে জাপানীগণ তাদের ঐতিহ্যবাদী প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি, বরং নতুন ও পুরাতনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ জাপানী জীবনধারায় ফুটে উঠেছে—যা যথার্থই জাপানী এবং অন্য সকল সংস্কৃতি হ'তে ভিন্ন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় জগৎ (১২)

এশিয়ার পূর্বে এবং আমেরিকার পশ্চিমে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এই জগৎ নির্ণয় করা হয়েছে। অবশ্য এক বিশেষ ভৌগোলিক ও সামুদ্রিক অবস্থান ব্যতীত অপর কোন শক্তিশালী নির্ণায়ক দ্বারা এই জগতের সীমা নিরূপণ সম্ভব নয়। এই জগতের মধ্যে তিন জাতীয় মানব-

www.pathagar.com

গোষ্ঠী বাস করে: পাপুয়া-নিউগিনি থেকে ফিজি পর্যন্ত মেলানেশীয়; তার উত্তরে ও ফিলিপাইনের পূর্বে মাইক্রোনেশীয়; এবং মধ্য প্রশান্ত-মহাসাগরে পলিনেশীয় সম্প্রদায়। এ সকল সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় জগতের কোন সমরূপী বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা বেশ কঠিন। তবু ঐ জগতের ঐতিহাসিক ধারা, সমুদ্র-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা এবং স্বকীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃতির দাবী রাখে।

সর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাংস্কৃতিক জগতের যে পরিকল্প উপরে দেওয়া হয়েছে, তার সীমা নির্ধারণের প্রসঙ্গে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু তার ফলে এই পরিকল্পের যথার্থতা বা গুরুত্ব কমে যায় না, কারণ উপরোক্ত বারটি জগৎ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আপেক্ষিক অবস্থান এবং আধুনিক বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি নির্ণায়ক দ্বারা গঠন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গ্রন্থ-বিবরণী

Brace, C. L. *The Stages of Human Evolution*, Englewood Cliffs, 1967.

Braidwood, R. J. *The Agricultural Revolution* Scientific American, September 1960, PP. 130-143.

Broek, J. O M. and Webb, J. W. *A Geography of Mankind*, New York, 1968.

Brunhes, J. *Human Geography*, New York, 1952.

Butzer, K. W. *Environment and Archaeology : An Introduction to Pleistocene Geography*, Chicago, 1964.

Childe, V. G. *Man Makes Himself*, London, 1936.

Chisholm, M. *Rural Settlement and Landuse*, London, 1962.

De Blij, H. J. *Human Geography : Culture, Society and Space*, New York, 1976.

Dicken, S. N. and Pitts, F. R. *Introduction to Cultural Geography*, New York, 1970.

Forde, C. D. *Habitat, Economy and Society*, London, 1934.

Haggett, P. *Locational Analysis in Human Geography*, London 1966.

Herbert, D *Urban Geography : A Social Perspective*, New York, 1972.

Hoebel, E. A. *Anthropology : The Study of Man*, New York, 1974.

Hoijer, H. and Beals, R. L. *Anthropology*, New York, 1965.

Issac, E. *Geography of Domestication*, Englewood Cliffs, 1970.

Johnson, J. H. *Urban Geography*, New York, 1967.

Kroeber, A. L. *Anthropology*, New York, 1948.

Mumford, L. *The City in History*, New York, 1961.

www.pathagar.com

National Academy of Sciences, National Research Council, *The Science of Geography*, Washington D. C., 1965.

Perpillsu, A. V. *Human Geography*, London, 1966.

Rapopont, A. *House Form and Culture*, Englewood Cliffs, 1969.

Russell, R. J, and Kniffen, F. B. *Culture Worlds*, New York, 1961.

Sauer, C. O. *Agricultural Origins and Dispersals*, New York, 1952.

..."*Cultural Geography*," in Wagner, P. L. and Mikesell, M. W. (eds), *Readings in Cultural Geography*, Chicago, 1962, pp. 30—34.

Shapiro, H. L. *Man, Culture and Society*, New York, 1960.

Sopher, D. E. *The Geography of Religion*, Englewood Cliffs, 1967.

Sorre, M. *The Concept of Genre de Vie*, in Wagner, P. L. and Mikesell, M. W. (eds), *Readings in Cultural Geography*, Chicago, 1962, pp. 399—415.

Spencer, J. E. and Thomas (Jr), W. L. *Cultural Geography*, New York, 1969.

Swartz, M. and Jordan, D. *Anthropology : Perspective o Humanity*, New York, 1976.

Taylor, G (ed), *Geography in the Twentieth Century*, London, 1958.

Thomas, (Jr), W. L. (ed) *Man's Role in Changing the Face of the Earth*, Chicago, 1956.

Vidal, de la Blache, P. *Principles of Human Geography*, New York, 1926.

Wagner, P. L. *The Human Use of the Earth*, New York. 1960.

... and Mikesell, M. W. (eds), *Readings in Cultural Geography*, Chicago. 1962.

White, L. A. *The Science of Culture*, New York, 1949.

www.pathagar.com